اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

দুনিয়া ও আখেরাত (২)

ভলিউম-২

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান এম, এম ; এফ, আর
প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ, রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

আদ্‌দুনিয়া ওয়াল্ আখেরাহ্ . . . . . **১—৬৭**

পুনরুত্থান সম্পর্কে ১

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও আখেরাতের স্থায়িত্ব . ৩

দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিশ্বাস মনে উপস্থিত না থাকা ৫

মানুষ প্রতি মুহূর্তে সফরে আছে ৬

প্রতি মুহূর্তে মানুষের আয়ু হ্রাস পায় ৮

আখেরাতের সফরের প্রতি গুরুত্ব প্রদান . . ৮

নফ্‌সের ধোঁকা ৯

এবাদতে গীবতের প্রতিক্রিয়া ১১

সুদের প্রতি আকর্ষণ এবং যাকাত হইতে পশ্চাদপসরণ ১৩

কার্যকরী এবং স্থায়ী মুরাকাবার আবশ্যকতা ১৫

আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ১৫

দুনিয়া খেল-তামাশা ভিন্ন কিছুই নহে . . ১৭

শুধু বিশ্বাস স্থাপন যথেষ্ট নহে ১৮

ফ্যাশন অনুসারীদের প্রশ্ন ও উহার উত্তর ১৯

মাশায়েখে কেরামের কর্তব্য ২২

অনভিজ্ঞ মুরশিদের কার্যপদ্ধতি ২৩

কামেল পীরের কার্যধারা ২৪

আমলে 'আযীমত' এবং 'রোখ্‌ছত' ২৬

শোক্‌রের তওফীক ও উহার প্রণালী . . . ২৮

বিপদের বিভিন্ন প্রকার ২৯

আযীমত এবং রোখ্‌ছতের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত . . ৩০

শরীঅতী সহজ ব্যবস্থার ক্রিয়া ৩১

সুন্নত পালন করার অর্থ ৩২

আমলই এল্‌মের উদ্দেশ্য ৩৩

তক্‌দীরের মাস্‌আলা ৩৪

তক্‌দীরে অবিশ্বাসী ধৈর্যহীন ৩৫

খোদার রহস্যসমূহের অনুসন্ধান ৩৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও হেকমত . . . ৪১

কোরআনে করীম তাজাল্লীবিশেষ ৪৫

তাজাল্লীর লক্ষণ বা ফল ৪৯

নশ্বরতা এবং অবিনশ্বরতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যক ৫১

দুনিয়ার কোন পদার্থই অনর্থক নহে . . . ৫৩

আল্লাহ্ তা'আলার অভাবশূন্যতার স্বরূপ ৫৪

দুনিয়া ও আখেরাতের স্বরূপ বুঝা ৫৭

নফ্‌সকে পবিত্র করিবার উপায় ৬০

পীরের হাল্‌কা এবং তাওয়াজ্জুহের তথ্য ৬১

দুনিয়ার প্রকারভেদ ৬৩

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় ৬৫

হামমুল আখেরাহ্ . . . . **৬৮—১১৫**

মহান ভবিষ্যদ্বাণী ৬৮

আল্লাহ্‌র ওয়াদা অলঙ্ঘনীয় ৬৯

-এর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ও ইহার ফলাফল ৭১

আল্লাহ্‌র কালাম স্বর হইতে পবিত্র ৭৩

শিশুদের শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞ আলেম নিযুক্ত থাকা উচিত ৭৩

বাধ্যতামূলক বিশ্বাস ধর্তব্য নহে ৭৪

মু'জেযার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা ৭৪

মহান ভবিষ্যদ্বাণীর তফ্‌সীল ৭৫

হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসাপদ্ধতি . . . ৭৭

কামেল পীরের পরিচয় ৭৯

সংসারানুরাগ ও পরকালের প্রতি উদাসীনতা ৮১

দুনিয়া উপার্জন এবং দুনিয়া অনুরাগের পার্থক্য ৮৫

দুনিয়ার মহব্বত এবং লালসার স্তর . . . ৮৬

বিষয় পৃষ্ঠা

রাসূল (দঃ)-এর মহব্বতের মাপকাঠি ৮৮
নারীর উপর সংসারাসক্তির প্রাধান্য ৯১
চিন্তার প্রয়োজন ৯৩
দুনিয়াদার অস্থিরতা ও চিন্তামুক্ত নহে ৯৬
দুনিয়া কাম্য হওয়ার বিভিন্ন স্তর ৯৭
আল্লাহ্ওয়ালাগণ মৃত্যুকে ভয় করেন না ৯৮
ঈমানের দৌলত মর্যাদার যোগ্য ১০০
আখেরাতের সহিত মনোযোগ স্থাপনের উপায় ১০২
বেহেশ্‌ত ও দোযখের বিস্তৃতি ১০৬
আজকাল প্রত্যেক মূর্খই মুজ্‌তাহিদ্‌ . . . ১০৮
ধর্মপ্রচারের নিয়ম ১০৯
আখেরাত অন্বেষণের নিয়ম ১১০
তেজারাতে আখেরাহ্‌ . . . . . . ১১৬—১৪৪
মুসলমানদের একটি ত্রুটি ১১৬
ইতিহাস এবং হাদীসের মধ্যে প্রভেদ ১১৭
ছাহাবায়ে কেরামের লক্ষ্য ছিল ধর্মের উন্নতি ১১৮
জাতির প্রতি সমবেদনাশীলদের লোক দেখান সমবেদনা জ্ঞাপন ১১৯
আলেমদের প্রতি প্রশ্নবাণের স্বরূপ ১২১
স্বার্থত্যাগের স্বরূপ ১২২
ধর্মকে বিভক্তিকরণের স্বরূপ ১২৩
আয়াতের অর্থ ১২৪
দৈহিক এবাদত ও আর্থিক এবাদতের মধ্যে পার্থক্য ১২৬
শরীঅত হইতে দূরে সরিয়া থাকা ১২৯
বড়লোকদের দুর্বল বাহানা ১৩০
আল্লাহ্‌র রাস্তার ব্যয় করা সম্বন্ধে ত্রুটি ১৩১
হাদিয়া কবূল করার শর্ত ১৩৩
বাতিল পীরের দৃষ্টান্ত ১৩৪

বিষয় পৃষ্ঠা

হাদিয়ার নিয়মাবলী ১৩৫
চাঁদা আদায় করার শর্তসমূহ ১৩৭
শরীঅতানুগ চাঁদার প্রতি উৎসাহ প্রদান ১৪০
ধর্মানুরাগের দৃষ্টান্ত ১৪১
ছাত্রাবাসের ফযীলত ১৪২
ছদ্‌কায়ে জারিয়ার ফযীলত্‌ ১৪৩
তায্‌কীরুল্‌ আখেরাহ্‌ . . . . . . ১৪৫—১৬৭
উপক্রমণিকা ১৪৫
আরেফ এবং সাধারণ লোকের এবাদতের পার্থক্য ১৪৬
ছাহাবায়ে কেরামের এলমের স্বরূপ ১৪৭
অনুসরণে লজ্জার কারণ ১৪৮
আল্লাহ্‌ওয়ালার দৃষ্টিতে দুনিয়া ১৫০
খোদা পর্যন্ত পৌঁছিবার সঠিক পন্থা ১৫২
সবকিছুই আমলের উপর নির্ভরশীল ১৫২
তক্‌দীর সম্বন্ধে তা'লীমের ফল ১৫৩
বিজ্ঞান এবং দর্শনের তথ্যানুসন্ধান ১৫৫
আলেমদের সংসর্গের প্রয়োজনীয়তা . . ১৫৭
দুনিয়া উপার্জন এবং দুনিয়ার অনুরাগ ১৫৯
ছগীরা গুনাহের প্রতি বেপরোয়া হওয়ার কুফল ১৬১
ধর্ম এবং উন্নতি ১৬২
ধর্মপরায়ণ লোকদের ত্রুটি ১৬৩
সূফিগণের ত্রুটি ১৬৫
যেকের এবং কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ১৬৬
বাইআ'তের স্বরূপ ১৬৭
তারজীহুল্‌ আখেরাহ্‌ . . . . . . ১৬৮—২০৮
আল্লাহ্‌ তা'আলার অভিযোগ ১৬৮
ক্ষতিকর বিষয়ের বিভিন্ন স্তর ১৭০
অসতর্কতার স্তর ১৭১

বিষয় **পৃষ্ঠা**

নামাযের দ্বারা মন্দ কাজের দ্বার বন্ধ হওয়া ১৭১
দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ফল ১৭২
আখেরাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকার কুফল ১৭৪
পূর্ণাঙ্গ তওহীদের ক্রিয়া ১৭৫
অদৃষ্টের স্বরূপ ১৭৬
শরীঅতে বিশ্বাসের স্থান ১৭৭
তওবার ভরসায় পাপ কার্য করা নিষিদ্ধ ১৭৮
দুনিয়ার প্রধান দুইটি শাখা ১৭৯
অনুমতি ব্যতীত পর-দ্রব্য ব্যবহার করা অবৈধ ১৮২
সহানুভূতি প্রকাশ ও ধার দেওয়ার ফল ১৮৩
চাঁদার টাকা আত্মসাৎ করা ১৮৪
ধর্মকে সুযোগ-সুবিধার অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে ১৮৫
খাছ লোকদের অপকর্ম ১৮৬
স্বভাব সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ১৮৮
মান-মর্যাদার মোহ অর্থলোভ হইতেও অধিক ১৯১
সম্মান মোহের ফল ১৯২
কেবল ধর্মের বাহ্যিক রূপের নাম ধর্ম নহে ১৯৩
রূহ এবং দেহের সম্পর্ক ১৯৫
খাঁটি নিয়তের লক্ষণ ১৯৭

বিষয় **পৃষ্ঠা**

নফ্‌সের গোপন ধোঁকা ১৯৮
মূলতঃ দুনিয়া অন্বেষণ করা নিষিদ্ধ নহে ১৯৯
নবী (দঃ)-এর অভ্যাসের অনুসরণ ১৯৯
কামেল পীরের অবস্থা ২০০
দুনিয়া কামনার প্রকারভেদ ২০২
দুনিয়া শব্দের নিগূঢ়তত্ত্ব ২০৪
আখেরাতের অবস্থা ২০৬
আখেরাতের অস্তিত্ব ২০৮
দারুল মাস্‌উদ্‌ .... **২০৯—২২৯**
উপক্রমণিকা ২০৯
কবর এবং রূহের সম্পর্ক ২১০
আখেরাতকে ভয় করার কারণ ২১১
আখেরাতের নেয়ামত সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফল ২১২
দানকৃত বস্তুর সওয়াব মৃত ব্যক্তিরা পাইয়া থাকে ২১৪
দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামতসমূহের সাদৃশ্য ২১৭
বেহেশ্‌তের বিস্ময়কর ফল ২১৯
আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ২১৯
বেহেশ্‌তে কোন কষ্ট নাই ২২১
রূহের অবস্থা ২২২
সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের স্বরূপ ২২৫
নেক আমলের তওফীক ২২৬
দুইটি এল্‌মী সূক্ষ্ম কথা ২২৭
সত্যিকারের এল্‌ম ২২৯

■

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

■

আদ্‌দুনিয়া ওয়াল্‌ আখেরাহ্‌

[ইহকাল ও পরকাল]

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ ـ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ○ لا وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

পুনরুত্থান সম্পর্কে

উল্লিখিত আয়াতটির পূর্বে পুনরুত্থানের মাস্‌আলা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপূর্বে নবুওয়ত সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহার পূর্বে একত্ববাদের বর্ণনা রহিয়াছে। মোটকথা, এই তিনটি বিষয় প্রায় পর্যায়ক্রমিকরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয়ত্রয় সমগ্র কোরআনে 'উম্মাহাতুল মাসায়েল' অর্থাৎ, যাবতীয় মাস্‌আলাসমূহের মূলরূপে গণ্য হইতেছে। অন্যান্য মাস্‌আলাগুলি ইহাদের পরিপূরক, উপক্রমণিকা বা মূল বক্তব্যের সূচনা। এই তিনটি বিষয় সর্ববিষয়ের মূলাধার। এতদসত্ত্বেও বলা যাইবে না যে, কোরআনের অন্যান্য মাস্‌আলাগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় নহে; বরং কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি মাস্‌আলাই অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এই তিনটি মাস্‌আলা কোরআনের অন্যান্য মাস্‌আলাগুলির উৎস ও লক্ষ্যস্থল বলিয়া অন্যান্য সমস্ত মাস্‌আলা অপেক্ষা এই তিনটির নিজস্ব মর্যাদা ও গুরুত্ব অধিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

গত পরশু দিল্লীস্থিত মাদ্রাসা আবদুল ওয়াহ্‌হাবে 'তাওহীদ' (একত্ববাদ) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছি। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে এবং গতকল্য পানিপথের মজলিসে 'নবুওয়ত' সম্বন্ধে যথেষ্ট বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং অদ্যকার ওয়াযে কেবল পুনরুত্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। তাহাতে কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ পর্যায়ক্রমে বিষয় তিনটিকে বর্ণনা করিয়াছেন, আমার এই সফরেও বিষয় তিনটি তদ্রূপ পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হইয়া যাইবে। এই আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তুর সারাংশ বটে। সুতরাং প্রথমত এই তিনটি বিষয় কোরআনের যাবতীয় মাস্‌আলাসমূহের মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, সেদিক হইতেও পুনরুত্থানের মাস্‌আলাটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এতদ্ভিন্ন এই আয়াতটি পুনরুত্থান বা আখেরাতের মাস্‌আলার সারাংশ, আর সারাংশই বস্তুর মূল ও নির্যাস হইয়া থাকে। এই হিসাবে ইহা অত্যধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয়। এই কারণেই সারাংশকে প্রাণবস্তু বলা হয়। তবে প্রথমত পুনরুত্থানের মাস্‌আলাটি সঙ্গীয় মাস্‌আলা দুইটির ন্যায় কোরআনের অন্যান্য মাস্‌আলার প্রাণবস্তু। অতঃপর এই আয়াতটি সেই প্রাণবস্তুর সারাংশ। সুতরাং ইহা আরও অধিক প্রয়োজনীয় বা প্রাণের প্রাণবস্তু বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব, ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইল। শ্রোতৃমণ্ডলীর উচিত গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গভীর মনোযোগ ও একনিষ্ঠতার সহিত এই বিষয়টিকে শ্রবণ করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। এই বিষয়টি যদিও নিতান্ত স্পষ্ট বলিয়া প্রমাণের বা বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে, কিন্তু আজকাল মানুষ এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া রহিয়াছে; সুতরাং সচেতন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সাধারণত নিয়ম এই যে, প্রকাশ্য বস্তু প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহে। তবে অসতর্ক হইয়া ভুলিয়া থাকার সময় সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। যেমন, কোন দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যদি দিবালোকে অন্ধের ন্যায় কাজ করে, তবে তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয়, "মিয়া! দিন প্রকাশ পাইয়াছে বা সূর্য উদিত হইয়াছে।" অথচ সেই ব্যক্তি এবং সারা জগতের মানুষ অবগত আছে যে, সূর্য উদিত হইয়াছে এবং দিবা আলোকিত হইয়াছে। কাজেই এরূপ উক্তি অনর্থক এবং অনাবশ্যক ছিল। অথচ কেহ ইহাকে অনর্থক বলে না, এরূপ সম্বোধনের উদ্দেশ্য সূর্যোদয়ের সংবাদ প্রদান নহে, কারণ, آفتاب آمد دلیل آفتاب "সূর্য নিজেই নিজের প্রমাণ।" ইহার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজনীয়ও নহে; বরং এখানে উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যোদয়ের সময় তোমার যেরূপ কাজ করা উচিত ছিল, তুমি তদ্রূপ করিতেছ না, ইহাতে সন্দেহ হয়, সূর্য উদিত হইয়াছে বলিয়া তুমি মনে কর না। কেননা, তুমি তদনুযায়ী কাজ কর না। সুতরাং আমি তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, হুঁশ ঠিক করিয়া কাজ কর। কিংবা কোন ব্যক্তি স্বীয় পিতার সহিত বেআদবী করিতেছে। তখন তাহাকে বলা হয়, মিয়া! ইনি তোমার পিতা। তবে এখানে কি পিতৃত্ব সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য? কখনই নহে। কেননা, পিতৃত্ব সম্বন্ধে বক্তা অপেক্ষা সম্বোধিত ব্যক্তি অধিক অবহিত। বক্তা হয়তো ২/৪ বৎসর ধরিয়া উহাদের পুত্রত্ব, পিতৃত্ব সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছে এবং সম্বোধিত ব্যক্তি জ্ঞান হওয়া অবধি 'আব্বা আব্বা' বলিয়া পয়সা চাহিয়াছে। এখানে পিতৃত্ব সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান উদ্দেশ্য হইলে দুনিয়াবাসী তাহাকে বেওকুফ বলিয়া অভিহিত করিত। অথচ কেহই তাহাকে বেওকুফ বলে না। অতএব, বুঝা গেল, এখানে শুধু এবিষয়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া উদ্দেশ্য যে, ইনি তোমার পিতা, পিতৃত্বের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। তোমার বর্তমান কার্যধারা পিতৃত্বের মর্যাদার বিপরীত; বরং

তোমার আচরণে মনে হয়, তুমি তাঁহাকে পিতা বলিয়াই মনে কর না। কেননা, এরূপ আচরণ অপরের সহিত করা হয়। এই হিসাবে এরূপ সতর্কবাণী নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসার যোগ্য মনে করা হয়।

অতএব, দেখুন, তাহার পিতৃত্ব যদিও সুস্পষ্ট এবং বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে, তথাপি সতর্কবাণী হিসাবে ইহাকে প্রশংসনীয় মনে করা হয়। এইরূপে আলোচ্য পুনরুত্থান বিষয়টিও যে নিতান্ত স্পষ্ট, এই স্পষ্টতায় কোনই সন্দেহ নাই। তথাপি মানুষ ইহাকে ভুলিয়া থাকার কারণে বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও আখেরাতের স্থায়িত্বঃ এখন আমি উদ্দিষ্ট বিষয় বর্ণনা করিতেছি। এই বিষয়টি দুই অংশের সমন্বয়ে যুক্ত। দুনিয়ার অস্থায়িত্ব এবং আখেরাতের স্থায়িত্ব। প্রথম অংশটি যদিও দৃষ্ট হওয়াবশত এতই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার যে, বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে। কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি তৎতুলনায় কঠিন এবং সূক্ষ্ম। কাজেই বর্ণনার মুখাপেক্ষী। 'তৎতুলনায়' শব্দটি এই জন্য বলিলাম যে, ইহাও অধিক কঠিন নহে। কেননা, গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং প্রথমটি যখন স্পষ্ট, তখন তৎসঙ্গে জড়িত বিষয়টি আপনাআপনিই বুঝা যাইবে এবং উহা মানিয়া লওয়া অনিবার্য হইবে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিষয়টি স্বভাবত বাধ্যতামূলকভাবে দ্বিতীয়টির অর্থ ব্যক্ত করিতেছে। কেননা, প্রথমটি অনুভবনীয়। যে বস্তু অনুভবনীয় বস্তুর সহিত জড়িত হয়, তাহাও অনুভবনীয়ই হইয়া থাকে। অনুভবনীয় বিষয় বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নহে। দুনিয়ার অস্থায়িত্বকে অনুভবনীয় এবং সর্ববাদিসম্মত এই কারণে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত জ্ঞানীগণ দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা সর্ববাদিসম্মত।

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব এবং আখেরাতের স্থায়িত্বকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলার কারণ এই যে, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস যখন দৃঢ় হইয়া যায় এবং একদিন এখান হইতে সকলেরই পরলোকে যাত্রা করিতে হইবে, এ কথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে, তখন এই বিশ্বাসের অনিবার্য ফল এই হয় যে, দুনিয়া এবং উহার আনুষঙ্গিক পদার্থসমূহের প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক বস্তু হইতে দৃষ্টি ফিরিয়া আসে, দুনিয়ার আসবাবপত্র হইতে আগ্রহ উঠিয়া যায়। কেননা, অস্থায়ী বস্তুর প্রতি ঘৃণা, বীতশ্রদ্ধ এবং উদাসীনতা সৃষ্টি হওয়া মানুষের স্বভাব। মানুষ একনিষ্ঠতাকে পছন্দ করে, ইহা আমরা দিবা-রাত্র দেখিয়া আসিতেছি।

যেমন, জনৈক মুসাফির সন্ধ্যাকালে কোন এক মুসাফিরখানার এক কামরায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সে উহাতে আসবাবপত্র রাখিয়া অবস্থানের এন্তেজাম করার পূর্বেই তাহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, সে উক্ত কামরায় মাত্র এক রাত্রির মেহমান। রাত্রি ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে এই কামরা ত্যাগ করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। এই কামরার সহিত মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য তাহার সাক্ষাৎ। অতঃপর এই মুসাফিরখানা কোথায়, আর সেইবা কোথায় ? উক্ত কামরার কোন স্থান যদি ভাঙ্গা থাকে, উহা মেরামতের খেয়াল তাহার আদৌ হয় না। কোন কড়িকাঠ স্থানচ্যুত থাকিলে সে উহার স্থানে আর একটি বদলাইয়া দেওয়ার চিন্তা করে না। কিম্বা সাজ-সরঞ্জামের কোন ত্রুটি থাকিলে উহা পূর্ণ করিয়া লওয়ার প্রতি আদৌ গুরুত্ব প্রদান করে না। অথচ এখানে তাহাকে এক রাত্রি তো নিশ্চয়ই যাপন করিতে হইবে এবং বিশ্রামও করিতে হইবে। মানুষ স্বভাবত সুখ-শান্তির উপকরণ যোগাইতে ইচ্ছুক; সুতরাং স্বভাবের তাড়নায় কামরাটি

মেরামত করিয়া লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মুসাফিরকে কয়েক ঘণ্টা পরেই এই কামরা ত্যাগপূর্বক অন্যত্র যাইতে হইবে বলিয়া সে তাহা করে না।

এইরূপে যখন মানুষের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইবে যে, দুনিয়া অস্থায়ী, ইহা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়া অনিবার্য, তখন মুসাফিরখানার কামরার ন্যায় দুনিয়ার প্রতি অবশ্যই তাহার ঘৃণা জন্মিবে। কিন্তু নিজের বাসগৃহের কামরার ব্যাপারে কেহ এরূপ ব্যবহার করে না, যদিও মুসাফিরখানার কামরা এবং নিজের বাসগৃহের কামরা উভয়কেই এক দিন ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া সমান বিশ্বাস আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা দেখিতেছি, যে ব্যবহার মুসাফিরখানার কামরার সহিত করা হয়, বাসগৃহের কামরার সহিত তদ্রূপ করা হয় না। বাসগৃহের কামরার কড়িকাঠ বাহির হইয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ উহা নূতন করিয়া লাগাইবার ফিকিরে লাগিয়া যায়। চুনের আস্তর মলিন হইয়া গেলে উহা চকচকে করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করে। সাজ-সরঞ্জামের ত্রুটি থাকিলে তাহা পূরণ করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়া যায়। এই প্রভেদ কেন ? এই জন্য নহে যে, খোদা না করুন, দুনিয়া এবং বাড়ী-ঘরের অস্থায়িত্বের প্রতি আপনার বিশ্বাস নাই ; বরং প্রভেদ এই জন্য যে, মুসাফিরখানার কামরায় প্রবেশের পূর্বেই আপনার এই বিশ্বাস পূর্ণভাবেই থাকে যে, প্রাতঃকালেই আপনাকে এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে। যতক্ষণ আপনি উক্ত কামরায় অবস্থান করেন, ততক্ষণ এই চলিয়া যাওয়ার কল্পনা অন্তরে হাজির থাকে। পক্ষান্তরে বাসগৃহের কামরায় প্রবেশ করার পূর্বে বা অবস্থানকালেও কোন সময় আপনার কল্পনাশক্তি আপনার মনে ইহা হইতে বিচ্ছেদের কল্পনা জাগাইয়া দেয় না ; বরং কোন সময় ভুলেও এই চিন্তা উদয় হয় না, অথচ এবিষয়ে আপনার সুদৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। কিন্তু সেই বিশ্বাস মনে হাজির থাকে না। পক্ষান্তরে মুসাফিরখানার কামরায় অবস্থানকালে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া যাওয়ার বিশ্বাস হামেশা মনে হাজির থাকে। এই কারণেই মুসাফিরখানার কামরা নিঃসঙ্গ ও ভয়ানক মনে হইয়া থাকে। উহার সহিত অন্তরের নামমাত্র আকর্ষণও হয় না। পক্ষান্তরে বাসগৃহের সহিত পূর্ণ মাত্রায় অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। উহাতে প্রবেশ করিলে মনে শান্তি আসে, তথাকার প্রত্যেকটি বস্তু ভাল মনে হয়। এখানে আসিলে মনের সকল ভয়-ভীতি দূর হইয়া যায়। উহাকে সজ্জিত করার আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে তরঙ্গায়িত হয়। অথচ ভয়ের কারণ অর্থাৎ, অস্থায়িত্বের বিশ্বাস এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রত্যয় উভয়ের মধ্যেই রহিয়াছে। প্রভেদ শুধু এই যে, মুসাফিরখানার বেলায় বিশ্বাসও আছে, তাহা মনে সর্বক্ষণ হাজিরও আছে। আর দুনিয়ার বাসগৃহের বেলায় বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাহা সর্বক্ষণ মনে উপস্থিত থাকে না।

আরও একটি প্রভেদ আছে যে, দুনিয়ার বিচ্ছেদ এবং অস্থায়িত্বের কল্পনা বর্তমানে বা নিকট ভবিষ্যতে হয় না ; বরং দূর ভবিষ্যতে ধ্বংস হওয়ার কল্পনা মনে আসে। শিশুরা ধারণা করে, আমরা এখন শিশু মাত্র। যৌবনে পদার্পণ করিব, জীবনের স্বাদ উপভোগ করিব। তারপরে কোন দিন বৃদ্ধ হইব। তখন মৃত্যু আসিবে। এইরূপে যুবকেরা কল্পনা করে, এখনও তো বৃদ্ধ হওয়ার বাকী আছে। এখনই কি ? এখন তো আমার এবং ধ্বংস হওয়ার মধ্যস্থলে এক মঞ্জিল ব্যবধান আছে। এইরূপে বৃদ্ধরাও মনে করেন যে, এইমাত্র বার্ধক্য আসিল। মাত্র আরম্ভ। ইহার মুদ্দত শেষ হইলে কোন এক সময় মৃত্যু ঘটিবে। মোটকথা, প্রত্যেক ব্যক্তি ধ্বংসকে নিজের জন্য দূরবর্তী ভবিষ্যতকালে মনে করিয়া থাকে।

আমি হজ্জে যাইতেছিলাম, আমার এক মুরুব্বী আমাকে বলিলেন ঃ এখনও তুমি বালক। এত কিসের তাড়াহুড়া আমাদের বয়সে উপনীত হইলে হজ্জ করিয়া লইও। আর যদি এতই তাড়াহুড়া থাকে, তবে আগামী বৎসর আমিও যাইতেছি, আমার সঙ্গে যাইও। আমি তাঁহাকে উত্তর করিলাম, হযরত, আপনার বয়স এত হইয়াছে, যদি আপনি আমাকে পাট্টা লিখিয়া দেন যে, আমিও এত আয়ু প্রাপ্ত হইব, তবে আমি অবশ্যই এখন যাওয়া বন্ধ করিয়া আপনার সঙ্গেই চলিতে পারি। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি এত আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার কাছে নিশ্চয়তা কি আছে যে, আমিও এত আয়ু প্রাপ্ত হইব, যে ভরসায় আমি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিব।

আমার সামনেরই আর একটি ঘটনা। এক বৃদ্ধের সহিত এক যুবকের সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধের স্বাভাবিক বয়স পূর্ণ হইয়াছিল। পরস্পর বিদায় গ্রহণের সময় হইলে বৃদ্ধ বলিল ঃ "দেখুন, আমার স্বাভাবিক আয়ু পূর্ণ হইয়াছে। আপনার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয় কি না হয় কে জানে? আমি ভোরের প্রদীপের ন্যায় প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি।" যুবক লোকটি বলিল ঃ আপনার জীবন প্রদীপতো রাত্র পাড়ি দিয়া ভোরের নিকটবর্তী হইয়াছে, কিছু আয়ু তো পাইয়াছেন। আমি তো সন্ধ্যাকালেরই প্রদীপ। এইমাত্র প্রজ্বলিত হইয়াছি। এমন কি, এখন পর্যন্ত ভালরূপে আলোকিত হইতেও পারি নাই। সামান্য বাতাসের ঝাপ্টা লাগিলে এখনই নিভিয়া যাইব। আপনি তো ভোরের প্রদীপ। সারা রাত্রি শান্তিতেই অতিবাহিত করিয়াছেন। এখন ভোরেই তো নিভিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। আর আমার তো নিরাপদে রাত্র কাটাইয়া যাওয়াই সন্দেহজনক। সুতরাং আমার অবস্থা আপনার চেয়ে অধিক নৈরাশ্যজনক এবং সাক্ষাতের নিরাশায় আমি আপনার চেয়ে অধিক অগ্রবর্তী। কাজেই এই সাক্ষাতের আক্ষেপ আপনার সঙ্গে কোন বিশেষত্ব নাই, ইহাতে আমরা উভয়েই সমান। মাশাআল্লাহ্‌, কেমন সুন্দর উত্তর! খুবই সত্য কথা বলিয়াছে —"আমি তো সান্ধ্য-প্রদীপ।" বায়ুর সামান্য এক ঝাপ্টাই আমাকে বিলীন করিয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইহা নূতন ধরনের বাক্‌পদ্ধতি বটে। প্রশংসনীয় উত্তর। যাহার সারমর্ম এই যে, বৃদ্ধ এবং যুবক সকলে প্রদীপের ন্যায়ই বটে। কেহ সান্ধ্য-প্রদীপ আর কেহ ভোরের প্রদীপ। নিভিবার আশঙ্কা হইতে কেহই মুক্ত নহে।

মোটকথা, মানুষ যে মনে করে, "এখনও তো বালক, অতঃপর যুবক হইব, তারপর বৃদ্ধ হইব, তারপর আরও বৃদ্ধ হইব।" বলুন তো হযরত! আপনার নিকট আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন কি সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে, আপনি যুবক হইবেন, তৎপর বৃদ্ধ হইবেন। কিংবা আপনি এমন কি ওহী প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, এমন চ্যালেঞ্জের সহিত দাবী করিতেছেন। আপনি কি খবর রাখেন? হয়তো এই মুহূর্তই শেষ মুহূর্ত হইতে পারে। সম্ভবত এই নিঃশ্বাসই শেষ নিঃশ্বাস। হয়তো এখনই আপনার জন্য দুনিয়ার জল-বায়ুবন্ধ হইয়া যাইবে। আপনার পার্থিব জীবন হয়তো নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছিয়াছে।

দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিশ্বাস মনে উপস্থিত না থাকা ঃ মোটকথা, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি আমাদের সকলেরই বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমাদের কথাবার্তা ও কল্পনা হইতে বুঝা যায়, মূলে অস্থায়িত্বের বিশ্বাস থাকিলেও এখন মনে উপস্থিত নাই। থাকিলেও দূরবর্তী ভবিষ্যতে ধ্বংস হইবে বলিয়া বিশ্বাস আছে। অথচ কোরআন শরীফের পরিষ্কার ঘোষণানুযায়ী শরীঅতের উদ্দেশ্য—প্রতি মুহূর্তে দুনিয়া ধ্বংস হওয়া সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস মনে উপস্থিত রাখিতে হইবে। যেমন—হাদীস শরীফে অনুরূপ বিশ্বাস লাভ করার উপায়ও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ "পৃথিবীতে মুসাফিরের ন্যায় বাস কর।" অর্থাৎ, পার্থিব জীবনকে এক মুসাফিরের সফরকালের

অবস্থার ন্যায় মনে কর। মুসাফির যেমন নিজের বিশ্রাম শিবিরে কিংবা মুসাফিরখানায় আসবাবপত্র কাছে রাখিয়া অবস্থান করে, তুমিও দুনিয়াতে এইরূপে বাস কর। দুনিয়াকে আখেরাতের সফরে বিশ্রাম শিবির বা মুসাফিরখানা মনে কর। মুসাফিরখানাকে যেমন কেহই স্থায়ী বাসস্থান মনে করে না, তুমিও দুনিয়াকে স্থায়ী বাসস্থান মনে করিও না। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহপূর্ণ বাণী যেহেতু আমাদিগকে সম্বোধন করিতেছে, তাই আমাদের রুচির প্রতিও কিছুটা লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কেননা, غريب অর্থাৎ, মুসাফির শব্দে তবুও দুনিয়াতে এক প্রকার অবস্থানের আভাস রহিয়াছে, যদিও তাহা মুসাফিরখানায় অবস্থানের ন্যায় হউক। কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এতটুকু অবস্থানের কল্পনাও নাই। তিনি বলিয়াছেন, "দুনিয়ার সহিত আমার কি সম্পর্ক? দুনিয়ার সঙ্গে আমার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেন কোন পথিক পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং চলিতে চলিতে পথে কোন বৃক্ষের নীচে ক্ষণেকের নিমিত্ত ছায়ায় দাঁড়াইয়াছে।"

প্রকৃতপক্ষে ইহাও كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ কথারই ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত কথায় সর্বপ্রকারের সন্দেহের অবসান ঘটিয়াছে। উদ্দেশ্যের বিপরীত কোন কল্পনা হইতে পারে না। অর্থাৎ, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না যে, আমরা দুনিয়াতে এক রাত্রির জন্য অবস্থান করিতেছি, ভোরে এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে—যেমন মুসাফিরকে ভোরে মুসাফিরখানা ত্যাগ করিতে হয়; বরং এইরূপ মনে কর যে, আমরা পথ চলিতেছি।

মানুষ প্রতি মুহূর্তে সফরে আছেঃ মনে কর যে, প্রতি মুহূর্তে আমরা সফরে আছি। প্রতি মুহূর্তে সফরের পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। যদি কোন বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোক সন্দেহ করে যে, "আমরা তো কোথাও অবিরত পথ অতিক্রমকারী লোক দেখিতেছি না; বরং কোন কোন অবস্থায় তো আমরা নড়াচড়াও করি না; বরং নড়াচড়ার বিপরীত নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকি। এমতাবস্থায় পথ অতিক্রম অসম্ভব। নিশ্চলতা ও পথ চলা দুই বিপরীত বিষয়। দুই বিপরীতের একত্র সমাবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব।" তবে ইহার উত্তর এই যে, পথচলার জন্য নড়াচড়া অনিবার্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নড়াচড়া হয় না বলিয়া আপনি কিরূপে বুঝিলেন? আপনি জানেন কি যে, নড়াচড়া দ্বিবিধ? স্থানের গতি এবং কালের গতি। এস্থলে স্থানের গতি অর্থাৎ, স্থানান্তরিত হওয়া তো অবশ্যই নাই। কেননা, প্রকাশ্যেই দেখা যায়, আখেরাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোন সিঁড়ি নির্মাণ করেন নাই, যাহা বাহিয়া আমরা আখেরাতে চলিয়া যাইতে পারি। আর না কোন সিঁড়ি আছে যদ্দ্বারা আমরা আসমানে যাইয়া পৌঁছিতে পারি। মাইল দুই মাইলের রাস্তাও নহে, যাহা অতিক্রম করিয়া আমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে পৌঁছিতে পারি। যেমন, আমরা রেল বা এক্কা গাড়ীতে আরোহণ করিয়া এক শহর হইতে অন্য শহরে গমন করিয়া থাকি।

অতএব, এস্থলে স্থানের গতি নাই বলিয়া আপনি কেমন করিয়া মনে করিতে পারেন যে, এখানে কালেরও গতি নাই? এখানে কালের গতি রহিয়াছে। অর্থাৎ, যদিও আমরা নিছক নড়াচড়া বা গতিহীন অবস্থায় থাকি, কিন্তু কালের গতি যথারীতি প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কালের গতি চলিতে চলিতে এমন এক মুহূর্তে যাইয়া পৌঁছিবে, যাহার পরে আমরা আখেরাতে থাকিব। কোন সিঁড়ি বাহিয়াও নহে, কোন রাস্তা অতিক্রম করিয়াও নহে; বরং কালের গতিতে—যাহা আমাদের ক্ষমতার বাহিরে। কেননা, আমরা কালের গতিকে বাড়াইতেও পারি না, কমাইতেও পারি না। রোধ করা তো দূরেরই কথা।

আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে, আমি অষ্টম ঘণ্টার মধ্যে থাকিয়া যাইব। নবম ঘণ্টায় পৌঁছিব না। আপাদমস্তক সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেও তাহা সম্ভব হইবে না। আপনাকে নবম ঘণ্টায় প্রবেশ করিতেই হইবে। কালের গতি আপনাকে বাধ্য করিবে। অন্যথায় যদি আখেরাতে পৌঁছিবার জন্য কোন সিঁড়ি থাকিত, তবে আমরা উহাতে আরোহণ না করিলেও পারিতাম, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা আখেরাতে পৌঁছার জন্য এমন আশ্চর্যজনক সিঁড়ি নির্মাণ করিয়াছেন, যাহা অনুভব করা যায় না, আমাদের ইচ্ছারও সেখানে কোন দখল নাই।

অতএব, কালের গতি অবশ্যই সাব্যস্ত আছে। দ্বিবিধ গতির একটি না থাকিলে অপরটিও না থাকা অনিবার্য নহে। আয়ু পথ অতিক্রমের জন্য শুধু গতির প্রয়োজন, কালের গতির মাধ্যমে তাহা সাব্যস্ত আছে। স্থানের গতি নাই, উহার প্রয়োজনও নাই। মোটকথা, কালের গতি প্রবাহে আমরা জীবন পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। সুতরাং হুযূর (দঃ)-এর এই বাণী—"আমার দৃষ্টান্ত ঐ পথিকের ন্যায়, যে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে"—সম্পূর্ণ ঠিক হইয়াছে। এই কালের গতির উপর আমাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার কোন দখল না থাকার কারণেই ইহা আমাদের অসতর্কতা বা ভুলিয়া থাকার কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ, আমাদের অবস্থার প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে না। আমরা বুঝিতে পারি না, এই মুহূর্তের পূর্ব মুহূর্তে আমাদের অবস্থা কি ছিল এবং এখন কিরূপ হইয়াছে এবং এই মুহূর্ত অতীত হওয়ার ফলে আমাদের পার্থিব জীবনের কি পরিমাণ অংশ নিঃশেষ হইল।

এই কারণেই বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন ঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন এক মাসের বয়স্ক হয়, তখন তাহার মাতা বলে, আমার সন্তান এক মাসের বয়স্ক হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে বুঝে না যে, তাহার আয়ুষ্কালের এক মাস কমিয়া গিয়াছে। তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্ত হইতে তাহার আয়ুষ্কালের প্রতিটি মুহূর্ত হিসাব হইতে আরম্ভ করে, যেই পরিমাণ সময় অতীত হইতে থাকে, তাহাই তাহার আয়ু হইতে কমিতে থাকে। যেমন, বরফের চাকা, যতই রাখা হয় ততই উহার অবয়ব কমিতে থাকে। এমন কি, শেষে এমন এক মুহূর্ত আসিবে, যখন উহা গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। মানবের আয়ুর অবস্থাও তদ্রূপ। এস্থলে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িল। কোন একজন গ্রাম্য লোক বিদেশে গিয়া চাকুরী গ্রহণ করিল। কিছুকাল পরে চাকুরী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন বাড়ীর দিকে চলিল, তখন বাড়ীতে নেওয়ার জন্য ফরমাইশী ও অন্যান্য ভাল ভাল সদাইয়ের সঙ্গে দুই চারি সের বরফও খরিদ করিল। আসবাবপত্র অনেক বলিয়া বহন করিয়া নিতে কষ্ট হইবে। সুতরাং লাগেজ হাল্‌কা করার উদ্দেশ্যে, তাহাদের গ্রামেরই দুই চারি জন যাত্রী—যাহারা তাহার একদিন পূর্বে বাড়ী যাইতেছিল, তাহাদের নিকট বরফের বাণ্ডিলটি দিয়া বলিল, ভাই, এই বরফগুলি আমার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলে বড়ই অনুগ্রহ হইবে, আমার বোঝা হাল্‌কা হইবে। আমিও ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আগামীকল্য যাইতেছি। তাহারা বরফের বাণ্ডিলটি তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল। গ্রাম্য লোকেরা বরফের গুণাগুণ কি বুঝিবে? কেবল এতটুকু জানে যে, উহা ঠাণ্ডা বস্তু। রীতি এই যে, এরূপ ক্ষেত্রে বাড়ীর লোকেরা আগন্তুকের জন্য পছন্দনীয় বস্তু রাখিয়া দেয়। সে আসিলে সকলে মিলিয়া তাহা পানাহার করে। এই রীতি অনুযায়ী তাহারা বরফকে অমনিভাবে সাধারণ কাপড়ে জড়াইয়া রাখিয়া দিল। পরবর্তী দিন সে ব্যক্তি বাড়ীতে আসিলে যাবতীয় উপঢৌকনের সঙ্গে কথায় কথায় বরফের কথাও উঠিল। হাঁ, আমি গতকল্য এক ব্যক্তির নিকট বরফও পাঠাইয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছ কিনা? বাড়ীর লোকেরা আনন্দের সহিত বলিল, পাইয়াছি।

উহা তোমার অপেক্ষায় তুলিয়া রাখা হইয়াছে, কেহ স্পর্শও করে নাই। সে বলিল, বল কি ? বরফ এখন পর্যন্ত রহিয়াছে। নির্বোধের দল! তোমরা বরফগুলি বিনাশ করিয়া দিয়াছ। দেখি, এখন পর্যন্ত কেমন করিয়া রাখা হইয়াছে ? তাহারা আনন্দের সহিত উহা আনিতে গেল। কাপড় খুলিয়া দেখিল, বরফের চিহ্নও নাই। কেবল ভিজা কাপড়খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। বরফের এত বড় চাকার কিছুই নাই। কাফন পড়িয়া রহিয়াছে, মুর্দা নাই।

দেখুন, ইহারা বরফের বৈশিষ্ট্য জানে না যে, ইহাকে যতই দীর্ঘ সময় রাখিয়া দেওয়া হয়, ততই কমিয়া যাইতে থাকে। অন্যান্য পদার্থ রাখিয়া দিলে রক্ষিতই থাকে। এই ধারণায় এবং বরফের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া তাহারা নিজের হাতেই বরফগুলি নষ্ট করিয়া দিল। বরফেরই অনুরূপ আমাদের আয়ু। অহরহ তাহা কমিয়াই যাইতেছে।

প্রতি মুহূর্তে মানুষের আয়ু হ্রাস পায়ঃ প্রতি মুহূর্তে আমাদের আয়ুর এক মূল্যবান অংশ বরফের ন্যায় গলিয়া যাইতেছে। আর আমরা ঐ গ্রাম্য লোকদের ন্যায় অসতর্ক রহিয়াছি। বুঝিতেছি না যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিণামও তাহাদের ন্যায়ই হইবে। তাহারা যেমন নিজের হাতে বরফ নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তদ্রূপ আমরাও নিজের হাতে নিজের আয়ু নষ্ট করিতেছি। কোন একদিন হাত ঝাড়িয়া পৃথক হইয়া যাইব এবং এই মহামূল্যবান আয়ু ফুরাইয়া যাইবে। তখন আফসোস্ করা ভিন্ন আর কোনই উপায় থাকিবে না।

এই অসতর্কতা এবং বেপরোয়া মনোভাবই দুনিয়ার যাবতীয় মজা এবং দুনিয়াদারগণের তৎপ্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ভিত্তি। আর ইহাই সেই আস্তিনের সাপ, যাহা ভিতরে ভিতরে আমাদের মূল উপড়াইয়া ফেলিতেছে। আমাদের মূল্যবান সফরের পথে বাধা উৎপন্ন করিতেছে। আহা! কতই না ভাল হইত, যদি আমাদের চক্ষু হইতে এই গাফলতের পর্দা উঠিয়া যাইত এবং আমরা সচেতন হইয়া এই দীর্ঘমেয়াদী মন্দা জ্বরের চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করিতাম। এই দুশ্চিকিৎস্য রোগের ঔষধের চিন্তা করিতাম। সেই ঔষধ—যাহা হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ন্যায় রোগীর জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহা এই যে, প্রতি মুহূর্তে নিজেকে পথচারী মুসাফির এবং দুনিয়াকে স্বীয় গন্তব্য স্থলের সড়ক মনে করি। এই ধ্যান এবং কল্পনা উঠিতে বসিতে সর্বক্ষণ নিজের মনে উপস্থিত রাখি, নিজের পার্থিব জীবনকে একজন মুসাফিরের সফরের অবস্থার চেয়ে অধিক মনে না করি। যেমন মুসাফির সফরে কেবল পথের সহায়ক এবং দ্রুত গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারার মত কার্যই করিয়া থাকে। সফরের পথ দীর্ঘ হওয়ার মত কিংবা উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার মত কার্য করে না। আপনি কখনও দেখেন নাই যে, দ্রুত গন্তব্যস্থানে গমনাভিলাষী মুসাফির পথে কোথাও খেলাধুলায় মগ্ন হয় কিংবা কোন চিত্তাকর্ষক বস্তুতে মজিয়া থাকে ; বরং পথে ঘটনাক্রমে কোন বাধা জন্মিয়া উদ্দেশ্য ব্যাহত হইলে এবং সফরের ক্ষতি হইলে তদ্দরুন মন খুব খারাপ হইয়া পড়ে। পথে যানবাহন বিনষ্ট হইলে নূতন বাহনের চেষ্টা করে। গাড়ী পৌঁছিতে বিলম্ব হইলে চিন্তিত হইয়া পড়ে। আবার গার্ড গাড়ীর গতি বাড়াইয়া উক্ত বিলম্বের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইলে তাহার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হয়। মোটকথা, কোথাও আকস্মিক ক্ষতি হইয়া গেলে তাহা পূরণের জন্য এবং ত্রুটি সম্পূরণের জন্য চেষ্টিত থাকে।

আখেরাতের সফরের প্রতি গুরুত্ব প্রদানঃ ইহা আমাদের দুনিয়ার সফরের অবস্থা। আমাদের উচিত অন্ততপক্ষে এতটুকু অবস্থা এবং গুরুত্ব আখেরাতের সফরেও দান করি, দুনিয়াবী সফরে যেমন প্রতিবন্ধক কারণগুলি এড়াইয়া চলি। আকস্মিক ক্ষতিতে মন বিষণ্ণ হয় এবং সহায়ক বস্তু

দেখিলে আগ্রহের সহিত তাহা অবলম্বন করি। তদ্রূপ আখেরাতের সফরে আমাদের প্রত্যেকটি গতিবিধি যাচাই করিয়া দেখা উচিত, ইহা প্রতিবন্ধক, কি সহায়ক। কোন অবস্থা বা কার্য সফরের প্রতিবন্ধক হইলে উহা পথের ডাকাত জ্ঞানে বর্জন করা উচিত। দুনিয়াবী মুসাফির যেমন নিজের ধন-প্রাণকে চোর-ডাকাত হইতে হেফাযত করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমাদেরও আখেরাতের সফরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলিকে চোর-ডাকাত মনে করা উচিত। পক্ষান্তরে যেসব কাজ উক্ত সফরের সহায় হয় এবং দ্রুত গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া আগ্রহ ও আনন্দের সহিত উহা অবলম্বন করা উচিত।

মোটকথা, প্রত্যেক মুহূর্তে নিজের অবস্থার প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রাখা এবং খেয়াল রাখা উচিত। আমাদের চলার পথে যেন কোন কণ্টক আত্মপ্রকাশ না করে, কিংবা আমাদের আলোময় পথে কোন অন্ধকারের চিহ্ন না পড়ে; যাহার অন্ধকারে আমরা পেরেশান ও দিশা হারাইয়া সরল পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়ি। সারকথা এই যে, কোন অবস্থাকে সহায়ক মনে করিলে অবলম্বন করা এবং প্রতিবন্ধক মনে করিলে বর্জন করা উচিত। কিন্তু আফসোস! আমাদের বিবেকহীনতা এবং বেপরোয়া মনোভাব সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে জ্ঞানশক্তি আমাদের যথেষ্ট আছে। আহা! যদি আমাদের চেতনা আসিত এবং গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতাম, তবে বুঝিতে পারিতাম যে, এসমস্ত কার্য আমাদের জন্য কত ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর। আমাদের এসমস্ত কাজের ফল বিনাশ ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

নফ্‌সের ধোঁকা ঃ আমাদের প্রতি এবং আমাদের অবস্থার প্রতি আফসোস! আমাদের অবস্থা এতই নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন সময় এসমস্ত অসঙ্গত আচরণের জন্য তওবা করিবার কল্পনা করিলেও ধোঁকাবাজ নফ্‌স তৎক্ষণাৎ বলে, মিয়া! এখনই কি হইয়াছে, একবার সাধ মিটাইয়া গুনাহ্‌র কাজ করিয়া লই। অতঃপর এক সঙ্গে তওবা করিলেই চলিবে। নচেৎ এমন হইতে পারে যে, আজ তওবা করিব, কাল আবার কোন চিত্তাকর্ষক গুনাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পাপ কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িব। তখন অযথা তওবা ভঙ্গ হইয়া যাইবে, পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইব। মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না। ইহার চেয়ে উত্তম এই যে, প্রথম গুনাহ্‌র দিক হইতে মনকে তৃপ্ত করিয়া লই, তৎপর তওবার চিন্তা করিব।

আফসোস! আমাদের অবস্থা সেই মুসাফিরের ন্যায়, যে এক দীর্ঘ সফরের সঙ্কল্প করিয়াছে। সফর কঠিন, পথ দুর্গম, সে পথিমধ্যে নিজের ঘোড়ার একটি পা ভাঙ্গিয়া দিয়া বলে, নূতন করিয়া আর একটি ঘোড়া লইয়া সফর করিব। অতঃপর দ্বিতীয় ঘোড়ারও এই অবস্থা করিল। মোটকথা, এইরূপে সে যদি নিজের বাহনের শত্রু হইয়া পড়ে, তবে বলুন, উক্ত মুসাফির এক পাও কি অগ্রসর হইতে পারিবে? কিংবা কোন বুদ্ধিমান কি বলিতে পারে যে, এই ব্যক্তি কোন না কোন উপায়ে এক সময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া যাইবে। কখনও না। এই উপায়ে তো সে এখান হইতে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারিবে না। আমাদের অবস্থাও এইরূপ। দিবা-রাত্র গুনাহ্‌র মধ্যে লিপ্ত থাকি এবং নিজের আয়ুরূপ বাহনের প্রত্যেকটির পা ভাঙ্গিয়া দ্বিতীয় বাহনের আশায় থাকি। অতঃপর কোন সময় যৎসামান্য টুটা-ফুটা এবাদতের তওফীক হইলে কিছু নামায-রোযা আদায় করি বটে, কিন্তু তাহার দ্বিগুণ পাপের বোঝা নিজের ঘাড়ের উপর চাপাইয়া দেই। আচ্ছা বলুন তো! এমতাবস্থায় আমরা পূর্বোক্ত মুসাফিরের ন্যায় আখেরাতের দিকে পা বাড়াইতে পারি কি? এক ইঞ্চি পথও অতিক্রম করিতে পারি কি? কখনই না; বরং উক্ত মুসাফির যেমন মধ্যস্থলে

পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তদ্রূপ আমরাও আখেরাতের সড়কের উপর এক পাও আগাইতে পারিব না। শুধু ইহাই নহে; বরং আমরা এত দুর্ভাগা যে, উক্ত মুসাফিরের ন্যায় এক অবস্থায়ও থাকিতে পারি না; বরং যতটুকু সম্মুখের দিকে অগ্রসর হই, উহার দ্বিগুণ পিছনের দিকে সরিয়া যাই।

এই সময় একটি ঘটনা মনে পড়িল। জনৈক লোক কোথাও চাকুরী করিত। ছুটিতে বাড়ী আসিল, ছুটি শেষ হইবার নিকটবর্তী হইলে সতর্কতাপূর্বক কিছু আগে বাড়ী হইতে যাইবার ইচ্ছা করিল। সন্ধ্যার সময় যাইতে বাড়ীর লোকেরা অনেক বাধা দিল; কিন্তু সে বড় একগুঁয়ে ছিল। বলিল ঃ "না। আমাকে এখনই যাইতে হইবে, নচেৎ আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে।" অবশেষে একগুঁয়েমি করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি হাঁটিতে লাগিল। অল্প দূর যাইতেই রাত্রি হইয়া গেল। ঘটনাক্রমে তখন মাসের শেষাংশ বলিয়া রাত্র খুব অন্ধকার ছিল, তদুপরি আকাশে গাঢ় মেঘও ছিল, কিছু বৃষ্টিও পড়িতেছিল। অন্ধকারে সে পথ ভুলিয়া রাস্তা হইতে এমনিভাবে সরিয়া পড়িল যে, সারা রাত ঘুরিয়াও ঠিক পথ পাইল না; বরং এমন চক্করে পড়িল যে, ঘুরিতে ঘুরিতে অর্ধরাত্রি পরে নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। রাত্রি ভোর হইতেই, সম্মুখে নিজের গ্রাম দেখা দিল। বাড়ীর সম্মুখের জামে মসজিদ এবং উহার সম্মুখে একটি বট গাছ। বস্তিতে পৌঁছিয়াই সে তাহা দেখিতে পাইল এবং মনে মনে বলিল ঃ ভাই, ইহা তো দেখিতে আমাদের গ্রামের মসজিদেরই মত। আবার দেখিতেছি কে যেন আমাদের সেখানকার বট গাছটিও উপড়াইয়া আনিয়া এখানে রোপণ করিয়াছে। কি দারুণ সাদৃশ্য। ঠিক তাহাই মনে হইতেছে। একটুও তো প্রভেদ নাই! আরও অগ্রসর হইয়া সম্মুখে নিজ গৃহের দরজা দেখিতে পাইল। উহা দেখিয়া বলিল ঃ ওঃ হো! ইহা তো একেবারে আমাদের ঘরেরই মত! যেন সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই ঘর; দরজা! চত্বর, চৌকি সবই সেইরূপ!

কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া এখন তাহার মনে কিছু ভয় হইতে লাগিল। আস্তে আস্তে বাড়ীর দরজায় যাইয়া পৌঁছিল। এখন তো আরও অস্থির। ইয়া আল্লাহ্! ব্যাপার কি! সত্যই ইহা আমাদের বাড়ী নহে কি? আবার ভাবে, ইহা আমাদেরই বাড়ী। আবার মনে হয়, স্বপ্ন নাকি? আবার বলে, না স্বপ্ন নহে, আমি তো জাগ্রতই আছি। এই তো আমার হাত পা নড়িতেছে। এমন সময় তাহার ভাতিজা ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। চাচাকে দেখিয়া সালাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? ভাতিজাকে দেখিয়া তাহার সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। কাজেই বলিতে লাগিল, لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ আমার উপর এবং আমার জ্ঞানের উপর অভিশাপ। সারা রাত্রি জঙ্গলে জঙ্গলে হোঁচট খাইয়া ঘুরিয়াছি, বৃষ্টিতে ভিজিয়াছি, বহু মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি। কিন্তু যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এক ফার্লংও অগ্রসর হইতে পারিলাম না। যেমন, কলুর বলদ আর কি, একই কেন্দ্রের চতুর্দিকে সারাদিন ঘুরিতে থাকে। মনে করে, বহু মাইলের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছে সেখানেই রহিয়াছে। যেই কেন্দ্রের উপর প্রথমে ঘুরিতে দেখা গিয়াছিল, এখন পর্যন্ত সেখানেই ঘুরিতেছে।

এইরূপই আর একজন লোক ছিল। তাহার ঘোড়াটি ছিল বড়ই অবাধ্য এবং চরম পর্যায়ের দুষ্ট। উহার এক দুষ্টামি ইহাও ছিল যে, মলত্যাগ করিয়া উহা না শোঁকা পর্যন্ত এক পাও সম্মুখে চলিত না। আরোহী উহার দুষ্টামিতে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কোন উপায় দেখিতেছিল না। ইতিমধ্যে তাহার এক সফরের প্রয়োজন পড়িল। অগত্যা সেই চরম অবাধ্য টাট্টুঘোড়া লইয়াই

সফরে যাত্রা করিল। অভ্যাসমত সে তাহার দুষ্টামি শুরু করিল, পায়খানা করিয়াই ঘুরিয়া তাহা শুঁকিতে লাগিল।

ঘটনাক্রমে অপর এক পথিকের সহিত তাহার দেখা হইল। সে ঘোটকটির ভাবগতিক দেখিয়া বিস্মিত হইল। বলিলঃ "আপনার ঘোড়াটি তো বিচিত্র ধরনের! এমন তো কোথাও দেখিও নাই, শুনিও নাই। আরোহী বলিল, ভাই, কি বলিব, হতভাগা ঘোড়াটি আমার জন্য মহাবিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার এই রোগের চিকিৎসার চেষ্টা করিয়া আমি ব্যর্থ হইয়াছি, কিন্তু হতভাগার সংশোধন হইতেছে না।" অতঃপর বিস্তারিত অবস্থা তাহাকে জানাইল। পথিক বলিলঃ দেখ, আমি ইহার কেমন সুন্দর চিকিৎসা করিতেছি। এই বলিয়া সে নিজের ঘোড়াকে উহার পশ্চাতে লইয়া আসিল। দুষ্ট ঘোড়াটি পায়খানা করিয়াই যখন শুঁকিবার জন্য পিছনের দিকে ঘুরিত, তখনই লোকটি পশ্চাৎ দিক হইতে উহার মুখের উপর চাবুক মারিত, উহাকে মুখ ঘুরাইতেই দিত না। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিয়া এবার অনেক দূর পথ তাড়াতাড়ি শান্তির সহিত অতিক্রান্ত হইয়া গেল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া উক্ত পথিক অন্য পথ ধরিল এবং বলিলঃ ভাই, আমার সাধ্যানুযায়ী এতক্ষণ আমি তোমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি। এখন আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি। এখন তুমি জান আর তোমার ঘোড়া জানে। সে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

লোকটি চলিয়া যাইতেই ঘোড়া পশ্চাৎ দিকে ঘুরিয়া দেখিল। যখন বিশ্বাস জন্মিল যে, লোকটি আর উহার পিছনে নাই, চলিয়া গিয়াছে। এখন আর কোন ভয় নাই, তৎক্ষণাৎ সেখানেই থামিল এবং পিছনের দিকে ফিরিয়া চলিল, আর যেই যেই স্থানে মলত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু শোঁকা হয় নাই, প্রত্যেক স্থানে পালাক্রমে শুঁকিয়া লইল। আরোহী যতই চেষ্টা-চরিত্র করিল, কিন্তু দুর্ভাগা ঘোড়াটি নিবৃত্ত হইল না। তাহার সম্পূর্ণ সফরকেই সে ব্যর্থ করিয়া দিল। ইহা সেই পথিক বন্ধুর অনুগ্রহেরই ফল। তাহার এই অনুগ্রহ না হইলে তাহার সফর ব্যর্থ হইত না। ঘোড়ার অভ্যাস অনুযায়ী চলিতে থাকিলে যত পথ অতিক্রম করিত, তাহা যেই প্রকারে যত সময়েই হউক না কেন অতিক্রান্তই হইত। কিন্তু পথিক বন্ধুর অনুগ্রহের ফলে এতক্ষণের সমস্ত মেহনত-পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া গেল এবং যেখানে ছিল পুনরায় সেখানেই আসিয়া পৌঁছিল। "هنوز روز اول" "যথা পূর্বং তথা পরং" এর অনুরূপ হইয়া গেল। অথচ সফরের বন্ধু নিজের ধারণা অনুসারে তাহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সময় বিশেষে অনুগ্রহও নিগ্রহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়। এই ঘটনায় তাহা পরিষ্কাররূপে দেখা গিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এই ঘটনারই অনুরূপ আমাদের অবস্থা। এই দেখুন না, আমাদের বিলাসিতা ও আরাম-প্রিয়তা। এসমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া কেমন বিস্ময়বোধ করিতেছি এবং ঘটনায় পতিত ব্যক্তিকে কেমন পরিতাপজনক অবস্থায় মনে করিতেছি। কিন্তু নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছি না যে, আমরা স্বয়ং এই রোগের রোগী। উক্ত মুসাফির অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আমাদের অবস্থা। আমাদের মধ্যে খোদাভীরু অনেক বান্দা আছেন, যাঁহারা শেষ রাত্রে উঠিয়া নফল নামায পড়িয়া থাকেন। বিনয়ের সহিত মুনাজাত করিয়া থাকেন। 'তওবা' এবং 'এস্তেগ্‌ফার' করেন। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায রীতিমত আদায় করেন এবং রোযা রাখিতে অভ্যস্ত আছেন।

এবাদতে গীবতের প্রতিক্রিয়াঃ আফসোসের বিষয়! তাহাদেরই কেহ কেহ প্রাতঃকালে উঠিয়া নিজের ভাই-বন্ধুদের সম্বন্ধে দুই একটা গীবত বা পশ্চাৎনিন্দা করিয়াই সারা রাত্রির নফল নামায, যাবতীয় এবাদত এবং পরিশ্রম বরবাদ করিয়া ফেলেন। সমস্ত এবাদত এবং পরিশ্রমের ফল এই

দুই একটি গীবতই থাকিয়া যায়। যাহা পারলৌকিক শাস্তির জন্য যথেষ্ট হয়। সমস্ত কৃত কাজ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। যেস্থানে ছিল আবার সেস্থানে আসিয়া দাঁড়ায়। যেমন, সেই দুষ্ট ঘোড়া উক্ত পথিককে পুনরায় প্রথম মঞ্জিলে আনিয়া রাখিয়া দিল। অনুরূপভাবে সফরের দুষ্টামির ফল এই বদভ্যাস পুনরায় আমাদিগকে তদ্রূপ অপমানজনক গহ্বরে আনিয়া ফেলে। এমন অসতর্কতা এবং বিবেকহীনতা সাক্ষাৎ খোদার গযব! ইহার একমাত্র কারণ দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিশ্বাস অন্তরে উপস্থিত নাই, আক্ষেপ তো ইহারই। আর আমরা যে আয়ুপথের সফর ও উহার দূরত্ব অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি, সেই সফরের অনুভূতিরই অভাব, অথচ এই অনুভূতি থাকা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা এতটুকু বুঝি না যে, দুনিয়াতে আমরা মুসাফির। আমাদের গন্তব্য পথ বহুদূর; বরং নিজদিগকে আমরা দুনিয়ার স্থায়ী অধিবাসী মনে করিতেছি। বস্তুত কালের গতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সর্বক্ষণ মুসাফির। সুতরাং আমরা যেমন স্থানীয় গতি হিসাবে নিজেকে মুসাফির মনে করি, তদ্রূপ কালের গতি হিসাবেও মুসাফির মনে করা উচিত। প্রভেদ শুধু এই যে, আখেরাতের সফরকে স্থানের গতি হিসাবে সফর বলা হয় না এবং এই প্রভেদের ভিত্তিতেই এবাদতের বিধান ও আহ্‌কামে পরিবর্তন ঘটে।

স্থানের গতিভিত্তিক সফরকেই ফেকাহ্‌শাস্ত্রে সফর বলা হয়। আপনারাও দিবারাত্র ইহাকেই সফর বলিয়া থাকেন। সুতরাং আপনারা এক স্থান হইতে অন্যত্র সফরে বাহির হইলে নামায কছর করার হুকুম বর্তে এবং আপনাদিগকে 'মুসাফির' বলা হয়। অন্যথায় 'মুকীম' বলা হয়। পক্ষান্তরে হুযূর (দঃ) যেই হিসাবে আপনাদিগকে সার্বক্ষণিক মুসাফির বলিয়াছেন, ইহার ভিত্তিতে শরীঅতের আহ্‌কামের পরিবর্তন ঘটে না। তাহার জন্য কছরের অর্থাৎ, চারি রাকাআত ফরয নামাযকে দুই রাকাআত পড়ার বিধান নাই। ইহা খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। পাছে নফ্‌স এবং শয়তান ধোঁকা না দেয় যে, হাদীস অনুযায়ী আমরা যখন মুসাফির সাব্যস্ত হইয়াছি, তখন কছরই আদায় করিব। দুই রাকাআতের স্থলে চারি রাকাআত কেন পড়িব? আল্লাহ্‌র দান বান্দা গ্রহণ করিবে। দুই রাকাআত হইতে তো অব্যাহতি পাওয়া গেল। যেমন, এক মূর্খের কাহিনী—সে সকল অবস্থায়ই কছর পড়িত। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি সকল অবস্থায় কছর পড়েন, ইহা তো ফেকাহ্‌শাস্ত্রের স্পষ্ট বিরোধিতা। সে উত্তর করিল, আমার কার্য ফেকাহ্‌র বিরোধী হইলেও হাদীসের অনুরূপ। কেননা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) আমাদিগকে عابر سبيل অর্থাৎ, 'পথচারী' বলিয়াছেন এবং আমাদের দুনিয়ায় অবস্থানকে সফর বলিয়াছেন। অতএব, আমি কছর পড়িয়া এমন কি অন্যায় কাজ করিতেছি?

এইরূপে আর এক ব্যক্তি এক মাইল পথ অতিক্রম করার প্রয়োজন হইলেও কছর পড়িত। কেহ তাহাকে বলিল, "আপনার এই কাজ তো বিচিত্র এবং অভিনব। ফেকাহ্‌শাস্ত্রের বিপরীত। কোন মায্‌হাবেই এক মাইলের সফরে কছরের বিধান নাই। কেহ ইহাকে সফরের পথ বলিয়া সাব্যস্ত করেন নাই।" সে উত্তর করিলঃ স্বয়ং কালামুল্লাহ্‌র প্রকাশ্য দলিল বিদ্যমান থাকিতে কোন ইমামের মত কেন গ্রহণ করিব? আল্লাহ্‌ বলেন, وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ "যখন তোমরা যমীনের উপর চল।"—ইহার চেয়ে অধিক দলিল আর কি হইতে পারে? যমীনের উপর চলা এক মাইল পথেও হইতে পারে। সুতরাং এই আয়াতের নির্দেশানুসারে আমি কছর পড়িতেছি। জিজ্ঞাসাকারী লোকটি বলিল, ضَرَبَ فِى الْاَرْضِ -এর অর্থ যখন যমীনের উপর বিচরণ করা, তখন আপনি গৃহ হইতে মসজিদে আসিয়াও তো কছর পড়িতে পারেন। কেননা, আয়াতে কোন

নির্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ নাই। গৃহ হইতে মসজিদে আসাকেও যমীনের উপর চলা বলিতে পারেন। কাজেই এতটুকু চলার জন্যও তো কছর পড়িতে পারেন?

এইরূপ আরও এক ব্যক্তি চলিতে চলিতে এমন জায়গায় আসিয়া মাগরিবের নামাযের সময় হইল, যেখানে একদিকে মসজিদ অপর দিকে খোলা মাঠ। মধ্যস্থলে সড়ক। মাগরিবের আযান হইয়া গিয়াছে। সে মাঠে গিয়া তায়াম্মুম করিয়া নামায আরম্ভ করিয়া দিল। নামাযের পরে কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মসজিদেই তো পানি রহিয়াছে, আপনি তায়াম্মুম কেন করিলেন? সে উত্তর করিলঃ "মিয়া, মসজিদে পানি থাকিলে আমার কি? আমার কাছে তো পানি নাই।" আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেনঃ وَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا তোমরা "পানি না পাইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।" বলুন, আমার নিকট পানি কোথায়? সুতরাং আমার জন্য তায়াম্মুমের বিধান রহিয়াছে।

এসমস্ত কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য—আমাদের রুচি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যথাসাধ্য নফ্‌সের আরামই খুঁজিয়া বেড়াই যে, নফ্‌সের উপর কোন প্রকার বোঝা না চাপাইয়া জিম্মা খালাস করা যায় কিনা। সুতরাং এই রুচি অনুযায়ী আপনি যেন এরূপ মনে না করেন যে, হাদীস অনুযায়ী আমরা যখন মুসাফির হইলাম, তখন আজ হইতে 'কছর' আরম্ভ করিয়া দেই। দুই রাকাআতের দায় হইতে তো অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। এখন হইতে আর সেই দুই রাকাআত পড়িতে হইবে না। হাদীসের মর্মানুযায়ী যেই অর্থে আমাদিগকে মুসাফির বলা হইয়াছে, সেই অর্থ আমাদের মধ্যে থাকুক বা না থাকুক, দুনিয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট বস্তু হইতে মন বিতৃষ্ণ হউক বা না হউক, নফ্‌সকে কোন প্রকারে আরাম দেওয়া আবশ্যক, উহার কোন ব্যবস্থা হউক।

সুদের প্রতি আকর্ষণ এবং যাকাত হইতে পশ্চাদপসরণঃ আমরা এমন বুযুর্গদের কথাও শুনি, যাঁহারা বিনাদ্বিধায় সুদ গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকে যদি বলা হয় যে, "সুদ হারাম, কেন ইহা গ্রহণ করিতেছেন?" নিতান্ত নির্ভীকভাবে তাঁহারা উত্তর করেন, "ভারতবর্ষ হইল দারুল হরব (শত্রু দেশ)। কোন কোন আলেমের মতে দারুল হরবে সুদ খাওয়া জায়েয আছে। আমরা তাঁহাদেরই মত মানিয়া চলিতেছি। ইহাতে ক্ষতি কি?" কিন্তু যাকাত আদায়ের সময় আসিলে যখন তাহাদের নিকট যাকাতের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, তখন বলেঃ "ভাই আমার সমস্ত ধনই তো 'হারাম।' সুদের ধন, অপরের হক। অপরের হকের মধ্যে যাকাত ওয়াজেব হয় কি? সুতরাং আমি যাকাত দিতে অক্ষম। আপনিই বলুন, যাকাত দিতে পারি কিনা? সুদের ধন না হইলে অবশ্যই আনন্দের সহিত যাকাত আদায় করিতাম।" দেখুন, নফসের কেমন জঘন্য চাল! কেমন বিচিত্র ভান! গ্রহণের বেলায় তো যাহাকিছু পাওয়া যায় হালাল না হইলেও হালাল, কিন্তু দেওয়ার বেলায় তাহা জঘন্য ধরনের হারাম; বরং দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হারাম। কেননা, এখন তো দিবার পালা। ফলকথা, নফ্‌স সর্বদা ইত্যাকার অজুহাত আবিষ্কার করিয়া থাকে এবং আরামের পথ খুঁজিতে থাকে। হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রঃ) বলেনঃ

چوں شتر مرغ شناس ایں نفس را　نے برد بار و نے پرد بر هوا
گر بپر گوئیش گوید اشترم　ور نهی بارش بگوید طائرم

অর্থাৎ, নফ্‌সের দৃষ্টান্ত উট পাখীর ন্যায়। উহাকে উড়িতে বলিলে উত্তর দেয়, "মিয়া, তুমিও আশ্চর্য মানুষ, আমাকে উড়িতে বলিতেছ। উটও কি কোন দিন উড়িয়াছে? আমি তো উট।

তুমি আমার আকৃতি দেখ না ? বল, আমার আকার উটের চেয়ে কিসে কম ?” আবার যদি বলা হয়, আচ্ছা যদি উট বলিয়া উড়িতে অক্ষম হও, তবে উটেরই কাজ কর। বোঝা বহন কর এবং সম্মুখে চল। তখন উত্তর দেয়, মিয়া ! তুমি দেখিতেছি অন্ধ এবং নির্বোধ। তুমি আমার বিরাট পাখা এবং লম্বা পালক দেখিতে পাও না ? পাখীকে কোথাও বোঝা বহন করিতে দেখিয়াছ ? পাখী তো কেবল উড়িয়া বেড়াইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ, যেই অবস্থাকে নিরাপদ মনে করে, উহাই অবলম্বন করে। যদি উট হইলে বোঝা বহন করিতে হয়, তবে পাখী বনিয়া যায়। আবার পাখী হইলে যদি উড়িতে বলা হয়, তবে উট সাজিয়া যায়।

নফ্‌সের অবস্থাও এইরূপ। আমোদ-আহ্লাদ এবং চিত্তবিনোদনের আয়োজন হইলে বেশ শক্তিশালী হয়। খুব লাফালাফি করে। প্রাণ খুলিয়া পাপের কাজ করে। কিন্তু নামায-রোযার আলোচনা উঠিলে দুর্বল সাজে। অজুহাত তালাশ করে। খোদার কোন নিরীহ বান্দা খোদার ভয়ে শেষ রাত্রে উঠিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে এই সান্ত্বনা দিয়া শোয়াইয়া দেয় যে, এখনও অনেক রাত বাকী। একটু পরেই উঠিয়া নামায পড়িবে। এইরূপে হাত বুলাইয়া পিঠ চাপড়াইয়া শোয়াইয়া রাখে এবং সান্ত্বনা দিতে থাকে। অবশেষে ভোর হইয়া যায়।

এইরূপে যদি খোদার কোন বান্দা খোদার ভয়ে খুব ভীত হইয়া পড়ে, পাপের ভয়ঙ্কর রূপসমূহ তাহার সম্মুখে শাস্তির বিভীষিকা টানিয়া আনিয়া উপস্থিত করে, তখন সে তওবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নফ্‌স তওবার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় এবং বলেঃ বাস্তবিক, তওবা তো অবশ্যই করা আবশ্যক। কিন্তু ইহাও ভাবা উচিত, আল্লাহ্‌র দরবারে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হই কিনা। আচ্ছা আরও কিছু পাপ কার্য করিয়া সাধ মিটিলে তখন সত্যিকারের তওবা করিয়া লইব। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

هرشبے گویم که فردا ترك ایں سودا کنم   باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم

“প্রত্যেক দিনই বলি, আগামীকল্য তওবা করিব।” পাপ যাহা করিবার ছিল করিয়া ফেলিয়াছি। দুই একটা যাহা বাকী আছে, তাহা করিয়া দৃঢ়তার সহিত তওবা করিব। “অতঃপর যখন আগামীকল্য আসে, তখন উহাকে পরবর্তী দিনের উপর ন্যস্ত করে।” এইরূপে ইহাও নফ্‌সের একটি ধোঁকা যে, হারাম মাল খাওয়ার সময় হিন্দুস্তানকে শত্রু দেশ বলিয়া বিনাদ্বিধায় সুদ খাইতে আরম্ভ করে। আবার যাকাতের সময় আসিলে মালকে হারাম বলিয়া দেয়। কেমন সুন্দর মনগড়া মাস্‌আলা আবিষ্কার করিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেননা, মালিকানা-স্বত্ব থাকিলেই মালের যাকাত ওয়াজেব হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল কাহারও অধিকারে থাকিলে তাহা হালালই হউক কিংবা হারামের সহিত মিশ্রিত হউক, যাকাত অবশ্যই ওয়াজেব হইবে। হারামের সহিত মিশ্রিত মালের যাকাত আদায় না করিলে দুই শাস্তির উপযোগী হইবে। হারাম মাল খাওয়ার জন্য এক শাস্তি এবং যাকাত আদায় না করার জন্য আর এক শাস্তি। কিন্তু যাকাত আদায় করিলে শুধু হারাম মাল খাওয়ার শাস্তি হইবে। যাকাত অনাদায়ের শাস্তি হইবে না। অবশ্য পারলৌকিক কঠিন দণ্ড ভোগ করার জন্য প্রথম অপরাধই যথেষ্ট। তথাপি যাকাত আদায় করিলে শাস্তি কিছু লাঘব তো হইবেই।

সারকথা এই যে, আমরা আখেরাতের সফর হিসাবে নিজদিগকে মুসাফির মনে করা উচিত ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে তো নিজেকে ‘মুকীম’ মনে করিলাম শুধু এই জন্য যে, সফরের অবস্থা মনে

রাখিলে দুনিয়ার আমোদ-আহ্লাদ ও মজা এবং সুখ-শান্তির উপকরণ উপভোগ করা যাইবে না। ফেকাহ্‌শাস্ত্র অনুযায়ী নিজেকে যে ক্ষেত্রে মুকীম মনে করাই উচিত ছিল, সে ক্ষেত্রে মুসাফির মনে করিলাম। কেন? শুধু এই কারণে যে, ইহাতে আরাম দেখা যায়। চারি রাকাআত ফরয নামায কছর করিয়া দুই রাকাআত পড়া যায়। অথচ আয়ুষ্কাল অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার হিসাবে আমাদের মুসাফেরী অবস্থার খেয়াল আদৌ হয় না যে, আমাদের এই দীর্ঘ সফরের গন্তব্যস্থান কোথায়?

কার্যকরী এবং স্থায়ী মুরাকাবার আবশ্যকতা ঃ এই কারণেই আমরা দুনিয়ার আমোদে মত্ত। আমোদ-স্ফূর্তির উপকরণ প্রস্তুতে, আমোদ-স্ফূর্তিতে মাতাল। দুনিয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট কোন কিছুরই খেয়াল নাই। আহা! কতইনা ভাল হয়, যদি আখেরাতের সফরের কথা সর্বদা আমাদের স্মরণ থাকে এবং একথার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া যায় যে, এই দুনিয়া হইতে অবশ্যই একদিন আমাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে। অথবা আমরা দুনিয়ার এক পথচারী মুসাফিরের ন্যায় কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য পথের পথিক এবং দূর-দারাযের রাস্তা অতিক্রমকারী। আমাদের এই কষ্টসাধ্য সফরের জন্য এক মহান গন্তব্যস্থান আছে। সেই গন্তব্যস্থানের মহত্ত্ব এবং গুরুত্বের কারণেই এই পথ অতিক্রমে আমাদের কতই না প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু এই ধারণার ত্রিসীমানায়ও আমরা নাই। অবশ্য চারি রাকাআত ফরযকে দুই রাকাআত করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি।

বন্ধুগণ! 'আমরা এ দুনিয়ায় আখেরাতের মুসাফির।' এই ওযীফা নিত্য করণীয় কাজ, উঠিতে বসিতে ও নিদ্রায়-জাগরণে এই ধ্যান যখন স্থায়ীরূপে হইয়া যাইবে, তখন ইহার অনিবার্য ফল এই দাঁড়াইবে যে, দুনিয়া হইতে মন উঠিয়া যাইবে। আকর্ষণের পরিবর্তে ঘৃণা উৎপন্ন হইবে। সুখ-শান্তি ও আমোদ-আহ্লাদের যাবতীয় উপকরণ চরম পর্যায়ের যন্ত্রণাময় এবং ঘৃণাব্যঞ্জক হইবে। প্রত্যেক পার্থিব পদার্থই বিতৃষ্ণা উৎপাদক হইবে। এক মুহূর্তও দুনিয়াতে তিষ্ঠিয়া থাকা কষ্টসাধ্য হইবে। স্বভাবত ইচ্ছা হইবে—যে প্রকারেই হউক চল, এখানে যখন স্থায়ীভাবে থাকাই যাইবে না, দুনিয়ার এ সমস্ত নেয়ামত যখন একদিন আমাদের হস্তচ্যুত হইবেই; সুতরাং আমরা এখনই এইগুলি ছাড়িয়া চলিয়া যাই। এমন জায়গায় চল—যাহা চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর, যেখানে নিরাপদে ও শান্তিতে জীবন যাপন করা যায়।

ইহা একেবারে স্থূল কথা যে, কোন অপরাধে কাহাকেও কারাগারে পাঠাইলে কারাগারের নির্জন কামরা তাহার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয়। এক মুহূর্তও মন টিকে না, সর্বক্ষণ এই চিন্তা থাকে, যে প্রকারেই হউক এখান হইতে বাহিরে যাই। এইরূপে দুনিয়ার অস্থায়িত্বের কথা সর্বক্ষণ মনে রাখিতে রাখিতে দুনিয়ার প্রতি মন বিরক্ত হইয়া পড়িবে। তখন এই আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল, চিত্তবিনোদনের নির্ঝরণী এবং যাবতীয় স্বাদ আস্বাদনের উৎস একটি ভীতিপূর্ণ, পরিতাপজনক এবং শঙ্কাপূর্ণ মজলিস ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। চতুর্দিক হইতে ভয়ঙ্কর দৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। তখন দুনিয়া কিংবা উহার কোন চিত্তাকর্ষক পদার্থের প্রতি মন লাগান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। দুনিয়া কিসে বর্জন করা যায়, উহার উপকরণ ও উপলক্ষ সম্বন্ধে চিন্তা হইবে এবং আখেরাত লাভ করার উছিলা ও উপকরণের অন্বেষণ হইবে।

আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ঃ এসম্বন্ধে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এই— وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا "যাহারা আমার রাস্তায় চেষ্টা করিবে, আমি তাহাদিগকে আমার পথ দেখাইয়া দিব।" সুতরাং এই

প্রতিশ্রুতি অনুসারে আখেরাতের সফরে তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে তাহা সহজেই পাইয়া যাইবে, পথ উন্মুক্ত হইবে। এতদিন এই উদ্দিষ্ট পথ সম্বন্ধে অমনোযোগী ও বেপরোয়া থাকিয়া হৃদয়ে যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইয়া যাইবে। ইতঃপর কৃতকার্যতার মহান উপায়সমূহ দৃষ্টিগোচর হইবে। উদ্দিষ্ট গন্তব্যস্থান নিকটবর্তী এবং সহজলভ্য মনে হইতে থাকিবে—এই তো হইল উক্ত ব্যাপারের কিতাবী প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত দুনিয়ার অস্থায়িত্ব এবং ইহাকে ছাড়িয়া যাওয়ার কথা সর্বদা স্মরণ থাকিলে ইহার প্রতি অনুরাগ লোপ পাইবে। অনুরাগজনিত অন্ধকার দূরীভূত হইবে, অজ্ঞতার অন্ধকার দূরে সরিয়া যাইবে। এখন অনিবার্যরূপে অন্তরে এক প্রকার আলোর উদয় হইয়া হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আখেরাতের সফরের পথ আলোকিত হইবে। আমল ও এবাদতের রাজপথ ঝকঝক করিবে। অতঃপর সফর করিয়া গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছা খুবই সহজ হইয়া পড়িবে। আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যলাভের আশা শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কেননা, পথের এই আলোর মধ্যে উক্ত আশার আলো দৃষ্ট হইবে। কারণ, খোদার সৃষ্টি অনর্থক এবং নিষ্ফল নহে, এসমস্ত সৃষ্ট পদার্থের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য এবং মঙ্গল অবশ্যই নিহিত রহিয়াছে। যাবতীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে ইহাও একটি উদ্দেশ্য যে, স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা কোন কার্যকে ফলশূন্য করেন নাই। সওয়াব হউক বা আযাব। এমন কখনই নহে যে, এই পরীক্ষা-জগতে মানুষ কোন কাজ করিবে এবং উহার বিনিময়ে সওয়াব কিংবা আযাব হইবে না। অবশ্য আমরা কোন কোন আমল দেখিতে পাইতেছি, যাহার বিনিময়ে দুনিয়াতে সওয়াব-আযাব কিছুই হয় না।

দেখুন, এক ব্যক্তি আজ শরীঅত অনুযায়ী কোন ভাল কাজ করিল। আমরা তাহার এই কাজের বিশেষ কোন ফল বা সওয়াব দেখিতে পাই না। আবার কোন ব্যক্তি শরাবপান বা যেনার ন্যায় জঘন্য কাজ করিল, ইহার দরুন পাপের কোন প্রতিক্রিয়া বা শাস্তি ভোগ করিতেও দেখি না। অতএব, জগতে যখন কোন ভাল-মন্দ কাজের সওয়াব বা আযাব ভোগ করিতে দেখিতেছি না, তখন বুঝা গেল যে, ইহা ছাড়াও অন্য কোন জগত নিশ্চয়ই আছে, যেখানে এসমস্ত কার্যের ফল পাওয়া যাইবে, উক্ত কার্যসমূহের ফল অবশ্যই ভোগ করিবে। আমরা এক মহান গন্তব্যস্থানের দিকে সফর করিতেছি, উপরোক্ত বর্ণনাটি একথার যৌক্তিক প্রমাণ।

'যুক্তি' বলিতে পারিভাষিক যুক্তি আমার উদ্দেশ্য নহে। এখানে আমার উদ্দেশ্য অগ্রগণ্যতা অর্থে যুক্তি। অর্থাৎ, সম্ভাব্য পদার্থের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব উভয়ই সমান। কোন প্রতিবন্ধক না থাকা অবস্থায় ইহার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের যেকোন একদিক অগ্রগণ্য হওয়াকেই আমি যৌক্তিক প্রমাণ বলিয়াছি। যেমন—আখেরাতও মূলত একটি সম্ভাব্য বিষয়, ইহারও উভয় দিক সমান। অর্থাৎ, হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। হওয়াও অবধারিত নহে, না হওয়াও অনিবার্য নহে। কিন্তু যুক্তি এবং বিবেক ইহার অস্তিত্বের দিককে অগ্রগণ্য মনে করে। কেননা, অস্তিত্বে কোন বাধা নাই। যেহেতু আজ পর্যন্ত ইহার অনস্তিত্বের পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য যৌক্তিক প্রমাণ উত্থাপন করা হয় নাই। সুতরাং বুঝা গেল যে, আখেরাত জ্ঞানত সম্ভব এবং উপরোক্ত অগ্রগণ্যতার যুক্তিতে উহার অস্তিত্ব সপ্রমাণিত। এখন অগ্রগণ্যতার উপরের ধাপ হইল 'অনিবার্যতা।' আর শরীঅতের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা উহার অস্তিত্ব অনিবার্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব, আখেরাতের অস্তিত্ব জ্ঞানত সম্ভাব্য ছিল। সত্যবাদী সংবাদদাতার বাণী উহাকে ওয়াজেবের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। সুতরাং আখেরাত জ্ঞানত সম্ভব এবং শরীঅতের বিধানে ওয়াজেব বা অনিবার্য।

ইহাকে "معاد" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মাআদ (معاد) বা আখেরাত প্রমাণ করার প্রয়োজন কেন হইল? শুধু এই কারণে যে, আমরা দেখিতেছি, অস্থায়ী পদার্থের অস্থায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলে উহা হইতে মন উঠিয়া যায়। অতঃপর দুনিয়া হইতে মন উদাসীন হইয়া পড়িলে অপর জগতের অন্বেষণ আরম্ভ হয়। উল্লিখিত বর্ণনায় ইহা ইতিপূর্বে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের কথা স্মরণ থাকিলে তাহাতে আখেরাতের স্থায়িত্বের কল্পনা অনিবার্যরূপে আসিয়া পড়ে। দুনিয়ার অস্থায়িত্ব যেহেতু প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহে। কাজেই ইহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আখেরাতের স্থায়িত্বও প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহে; বরং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। এতদুভয়ের অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকার বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, বিষয়টি স্পষ্ট। কিন্তু মানুষ ইহা হইতে অমনোযোগী হইয়া পড়ার কারণে সতর্ক করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। সেই সতর্ক করার জন্য এখন ইহা বর্ণিত হইতেছে।

দুনিয়া খেল-তামাশা ভিন্ন কিছুই নহেঃ এই অমনোযোগিতা নিরসনের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ ○ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ "এই দুনিয়া এবং ইহার সংশ্লিষ্ট সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নহে।" আল্লাহ্ তা'আলা আখেরাতের অস্তিত্ব প্রমাণে এই আয়াতটি উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ ইতিপূর্বে বর্ণিত আখেরাত সম্বন্ধীয় আয়াতেও ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সম্মুখের দিকে وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ "আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন" আয়াতটি দ্বারা আরও অধিক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। "দুনিয়া খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নহে" কথা হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে এমন একটি কথা ব্যক্ত করিতে চান, যাহা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াতে বুঝা যায় না। তাহা এই যে, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস যদিও وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি বেহেশ্‌তের কামরায় স্থান দিব" এবং وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ আয়াত দ্বারাই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে; আর আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এতটুকু যথেষ্টও বটে; কিন্তু কেবল আখেরাতের অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান এবং জ্ঞানদানই এস্থলে উদ্দেশ্য নহে; বরং এই বিশ্বাস হইতে যে ফল উৎপন্ন হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান দান করাই প্রধান উদ্দেশ্য—তাহা হইল আখেরাতের জন্য আমল করা। অথচ দুনিয়ার ব্যস্ততা ইহার প্রতিবন্ধক। এখানে যেন কারণের দ্বারা আদি কারণের প্রমাণ আনয়ন করা হইয়াছে। কেননা, দুনিয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট পদার্থসমূহ যখন খেল-তামাশার শামিল বলিয়া স্মরণ থাকিবে, তখন ইহা আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং আখেরাতের মুসাফির হইতে কখনও এমন আশা করা যায় না যে, সে নিষিদ্ধ কার্যে মশ্‌গুল হইয়া নিজের মূল্যবান সফর ও দুর্গম পথকে বাধাসঙ্কুল করিয়া তুলিবে। দুনিয়ার উদ্দেশ্যের মুসাফিরই যখন নিজের সফরে এইরূপ বাধাজনক কার্য হইতে দূরে থাকে, তখন আখেরাতের মুসাফিরের তো নিষিদ্ধ কার্যসমূহে লিপ্ত হইয়া সফরে বাধা সৃষ্টি করা হইতে অবশ্যই দূরে থাকা উচিত।

সুতরাং বুঝা গেল যে, আখেরাতের অস্তিত্ব প্রমাণ প্রসঙ্গে এই আয়াতটি (وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ) বর্ণনা করার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য এই যে, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন যেমন উদ্দেশ্য, তদ্রূপ সংসারের প্রতি বিরাগ উৎপাদনও উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই এবাদত বা আমলের প্রতি উৎসাহ জন্মিবে। অতএব, মূল উদ্দেশ্যটি যেন এল্‌ম (বিশ্বাস) এবং আমল (এবাদত)—দুইটি অংশ দ্বারা প্রস্তুত হয়। প্রথম এবং শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে আখেরাতের

প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দিকে মন আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং মধ্যবর্তী আয়াতে দুনিয়া হইতে বিরত থাকার তা'লীম দিয়া আখেরাতের জন্য এবাদত করার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা যেখানেই এল্‌ম বা বিশ্বাস সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে কেবল জ্ঞান দান করাই উদ্দেশ্য নহে; বরং তদনুযায়ী আমল করাও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। আর আমলের জন্য এল্‌ম হয় একটা উছিলা মাত্র।

শুধু বিশ্বাস স্থাপন যথেষ্ট নহেঃ অনেকে ইহা মনে করিয়া খুশী যে, আখেরাতের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। আমার কিসের চিন্তা? সাবধান! ইহাও নফ্‌সের একটি অতি সূক্ষ্ম ভ্রান্ত ধারণা। উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কেবল বিশ্বাস কখনও যথেষ্ট নহে। উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় বিশ্বাস বা ঈমান কিছুটা হিতকর হইলেও আমল ভিন্ন ইহা পূর্ণমাত্রায় ধর্তব্য নহে। আজকাল মানুষের রুচি বিচিত্র ধরনে বিগড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা কেবল বিশ্বাস স্থাপনই মুক্তির যথেষ্ট উপায় মনে করিয়া থাকে, আমলের যেন কোন আবশ্যকই নাই। ইহার একমাত্র কারণ হইল, আজকাল লোকে এল্‌ম ও আলেমদের সহিত যোগাযোগ এবং তাঁহাদের সাহচর্য ত্যাগ করিয়াছে। বুযুর্গানের কাছেও ঘেঁষে না। যে সমস্ত সভায় দ্বীনি এল্‌মের আলোচনা হয়, তথায় তাহাদের মন বসে না, ইহার ফলেই এসমস্ত ভুলে পতিত হইয়া বিপথগামী হইয়া যায়। আমল তো আমলই। যেই ঈমানকে সকলেই একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকে, তাহাতেও বিচিত্র গোলমাল। বিশ্বাসের সংশোধনও আলেমের সংসর্গ ভিন্ন দুষ্কর। অতএব, শুধু বিশ্বাস তো প্রথমত যথেষ্টই নহে। যদিও তাহাদের ধারণানুসারে ইহাকে যথেষ্ট মনে করাও হয়, তথাপি আফ্‌সোসের বিষয়! উহাকেও পূর্ণ করিয়া লয় না।

এখন অনেক কম লোক এমন পাওয়া যাইবে, যাহাদের আকীদা শরীঅতের বিধানানুরূপ এবং তাহারা সেই সত্যপন্থী দলের শামিল হইতে পারে, যাঁহাদের সম্বন্ধে হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ "আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে ৭২ দলই দোযখী, কেবলমাত্র একটি দল মুক্তি পাইবে।" উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হুযূর, তাহারা কোন্ দল? তিনি উত্তর করিলেনঃ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ অর্থাৎ, "যে দলে আমি এবং আমার ছাহাবীগণ রহিয়াছি।" অতএব, দেখুন, অতি অল্প লোকই এই দলে রহিয়াছে। যাহারা আছেন তাহারাও এরূপ ভুলের মধ্যে রহিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে কতক লোক مَا اَنَا عَلَيْهِ -এর দলকে কেবল বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। অর্থাৎ, তাহারা বলে, "হুযূর (দঃ) এবং তাঁহার ছাহাবাগণের সহিত শুধু বিশ্বাসের ঐক্য রক্ষা করিলেই মুক্তি পাওয়ার উপযোগী দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হইবে। অথচ ইহা তাহাদের ভুল। কেননা, 'যাহা' শব্দটি এখানে ব্যাপকার্থক, কিন্তু তাহারা ইহাকে নির্দিষ্টরূপে কেবল বিশ্বাসের সহিতই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। অথচ বিশ্বাস, আমল, স্বভাব-চরিত্র, অভ্যাস যাবতীয় বিষয় এই مَا, শব্দের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে যেমন বিশ্বাস সংশোধনের প্রয়োজন রহিয়াছে, তদ্রূপ বিশ্বাসের পরিপূরক যাবতীয় কার্যাবলী এবং স্বভাব-চরিত্রেরও প্রয়োজন আছে। যাহারা কেবল বিশ্বাস সংশোধন করিয়াই সত্যপন্থী হওয়ার দাবী করিতেছে এবং নিজদিগকে مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ -এর দলে শামিল করে। অথচ তাহাদের কার্যাবলী এমনই যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীদের কার্যাবলীর সহিত কোনই সামঞ্জস্য নাই। তদুপরি বড় আপত্তিজনক কথা এই যে, ইহারা যে সমস্ত বুযুর্গ লোকের সহিত সম্পর্কিত, তাঁহারাও কেবল আকীদা ঠিক করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন এবং আমল ও এবাদতের

কাছেই যান না ; বরং খুশীর সহিত বলিয়া থাকেনঃ "ভাই! অমুক বুযুর্গ লোকের আকীদা খুবই উত্তম।" যেন একথায় তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়া দিলেন, তাঁহার কার্যাবলী ফাসেক লোকের মত হইলেও সেদিকে লক্ষ্যই করা হয় না।

অথচ চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে—আমল ভিন্ন এই আকীদা সংশোধন শুধু মৌখিক জমা খরচ, সেই আকীদার উপর পূর্ণ নির্ভরও নাই। কেননা, দৃঢ় বিশ্বাস স্বভাবত আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তির শরীঅতসম্মত আকীদা দৃঢ় হয় এবং বিশ্বাসের দিক দিয়া সে "مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ" -এর পন্থী হয়, তবে তাহার আমল ফাসেক-ফাজেরের ন্যায় হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বিপদের কারণ এই যে, আমাদের দলে যাঁহারা সত্যপন্থী হওয়ার দাবী করেন, তাঁহাদের প্রতি খোদার রহমত হউক, তাঁহারাও مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ -এর দলভুক্ত হওয়ার জন্য শুধু আকীদা সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় হওয়াকে যথেষ্ট মনে করেন। তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্র ও আমলের প্রতি লক্ষ্য করেন না। যখন ইঁহারাই আমলের প্রতি লক্ষ্য করেন না এবং উপেক্ষা করিয়া চলেন, তখন তাঁহাদের অনুসারীরাও স্বাধীন হইয়া পড়ে এবং প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ করিতে থাকে। তাহাদের কেহ কেহ বাতিলপন্থী ও প্রবৃত্তির বশীভূত লোকের জীবন যাপন পদ্ধতি এবং দুনিয়াদার লোকের ফ্যাশন্ অবলম্বন করে। বুযুর্গানে দ্বীনের নিয়ম-পদ্ধতিকে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখান করে। সত্যপন্থীগণের শিক্ষা-দীক্ষাকে দাকিয়ানুসী যুগের ভাবধারা আখ্যা দিয়া থাকে। সত্যপন্থীর দাবীদারগণের ইহা বিরাট ভুল ; বরং ইহা নফ্‌সের একটি বড় ধোঁকা। সে তাহাদিগকে শরীঅত অনুমোদিত কার্য সংশোধন করা হইতে বিরত রাখিয়াছে।

মোটকথা, রাসূল (দঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের সহিত ঐক্য রক্ষা করা যেমন আকীদার ব্যাপারে অত্যাবশ্যক, তদ্রূপ অন্যান্য কার্যকলাপেও অত্যাবশ্যক। এখন বুঝা গেল যে, সুন্নী জামাআতে কেবলমাত্র তাঁহারাই সত্যপন্থী হওয়ার দাবী করিতে পারেন, যাঁহারা আকায়েদের ন্যায় যাবতীয় কার্যকলাপ এবং জীবন যাপন পদ্ধতিতেও হুযূর (দঃ) এবং তাঁহার সাহাবায়ে কেরামের পন্থা-পদ্ধতির অনুসারী। তাহাদের স্বভাব-চরিত্র হুযূর (দঃ)-এর স্বভাব-চরিত্রের নমুনা এবং তাহাদের সামাজিকতা হুযূর (দঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সামাজিকতার ন্যায় সৌন্দর্যমণ্ডিত। তদুপরি বুযুর্গানে দ্বীনের চাল-চলনকে প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করেন। অন্তরে বুযুর্গানে দ্বীনের মর্যাদা এবং চোখে তাঁহাদের সম্মান ও ভক্তি বিদ্যমান থাকে। বাতিলপন্থীগণের চাল-চলনের প্রতি ঘৃণা হয়।

ফ্যাশন অনুসারীদের প্রশ্ন ও উহার উত্তরঃ আপনাদের এইরূপ হওয়া উচিত নহে, যেরূপ হক্‌পন্থীদের রীতি-নীতিকে উপেক্ষার যোগ্য মনে করিয়া আধুনিক নব্য যুবকরা নয়া যমানার ফ্যাশনকে প্রাণের সহিত গ্রহণ করা নিজেদের আকীদার শামিল করিয়া লইয়াছে। যখন তাহাদের বলা হয়, হকপন্থী হইতে হইলে আকীদার ন্যায় উহার পরিপূরক আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে, অথচ তোমরা তাহা ছাড়িয়া দিয়া হক্‌পন্থী হওয়ার দাবী করিতেছ। তোমাদের দাবী তখনই সত্য বলিয়া মানা যাইবে, যখন তোমরা ভিতরের ন্যায় নিজেদের বাহিরকেও হকপন্থীদের অনুরূপ করিয়া লইবে এবং তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্র, জীবনযাত্রা প্রণালী, কার্যকলাপ, বেশভূষা ও সামাজিক আচরণ অবলম্বন করিবে। তখন তাহারা বাহ্যদৃষ্টি অনুসারে এক জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলে যে, আপনি বলিতেছেন, হকপন্থী হইতে হইলে সকল বিষয়েই নবী (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করিতে হইবে, তবে প্রথমে নিজেকেই সংশোধন করিয়া লউন। অতঃপর আমাদিগকে

উপদেশ দিন। কেননা, আপনার কথা অনুযায়ী আপনি নিজেও হকপন্থীদের দল হইতে বহির্গত এবং "مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ" -এর ছেরাতুল মুস্তাকীম হইতে দূরে পড়িয়া যাইতেছেন।

কবি বলেনঃ چاه کن را چاه در پیش

"কূপ খননকারী নিজেই কূপের সম্মুখীন।" আপনি আমাদিগকে পথভ্রষ্ট বলিতেছিলেন, এখন দেখিতেছি আপনি নিজেই পথভ্রষ্ট। বলুন তো, এমন আঁটসাঁট আচ্‌কান এবং বুক খোলা চোগা হুযূর (দঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনও পরিয়াছিলেন কি? এই প্রকার সেলিম শাহী জুতা হুযূর (দঃ) এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ কখনও পরিধান করিয়াছিলেন? ইতিহাসে কোথাও হুযূরের ইত্যাকার জীবন-যাপন প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায় না। এই সঙ্কীর্ণমুখী চুড়িদার পায়জামা পরিধান করা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ হাদীসে কিংবা ছাহাবায়ে কেরামের কোন্ বাণীতে প্রমাণিত আছে? বরং ইতিহাসের পাতা জোরাল ভাষায় এবং হুযূর (দঃ)-এর হাদীস স্পষ্ট শব্দে আমাদিগকে অবগত করিতেছে যে, হুযূর (দঃ)-এর এবং সমস্ত ছাহাবায়ে কেরামের মোটামুটি পোশাক ছিল তিনখানা কাপড়—তহবন্দ, টাখ্‌নু বা গিরার উপর পর্যন্ত কোর্তা, একটি চাদর। যাঁহারা একান্ত দরিদ্র ছিলেন, তাঁহারা কেবল এক কোর্তা কিংবা এক তহবন্দ পরিয়াই কাল যাপন করিতেন। অবশ্য হুযূর (দঃ) এবং ধনবান ছাহাবীগণ পাগড়ী এবং জুব্বাও পরিধান করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। আর জুতা পরিধান করিতেন সেই দোয়ালবিশিষ্ট সেণ্ডেল। মোটকথা, আপনাদের ন্যায় এই ধরনের পোশাক, জুতা তাঁহারা পরিতেন বলিয়া কোথাও উল্লেখ নাই। জনাব! ইহাও বলুন তো! এই পোলাও-কোরমা, বিরিয়ানী প্রভৃতি মুখরোচক খাদ্য হুযূর (দঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন কি? হুযূর (দঃ) তো অধিকাংশ সময়ই যব কিংবা খোরমা খাইয়াই জীবনধারণ করিতেন। কচিৎক্রমে গম ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ -এর দলভুক্ত হওয়ার জন্য আপনারাও ঘৃতপক্ক ও চর্বিযুক্ত খাদ্য বর্জন করুন এবং গমের রুটি ও যবের ছাতুর উপর জীবনধারণ করুন। অতঃপর আপনাদের হকপন্থী হওয়ার দাবী শোভা পাইবে।

কিন্তু এই প্রশ্নও প্রবৃত্তির এক প্রকার জটিল জালবিশেষ। ইহার উত্তরে আমি বলিব, যদিও শব্দটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বস্তুই ইহার অন্তর্ভুক্ত, তথাপি ইহার ব্যাপকতার অর্থে এক প্রকার সীমাবদ্ধতা রহিয়াছে। ইহার পর বাক্যটির অর্থ এইরূপ নির্দিষ্ট হয় যে, হুযূর (দঃ)-এর কার্যকলাপ এবং চাল-চলন অবশ্য প্রত্যেক বিষয়েই অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণত কার্যকলাপ এবং চাল-চলন বলিতে যাহা বুঝায় এখানে কেবল তাহাই উদ্দেশ্য নহে। অর্থাৎ, কেবল তাঁহার কার্যাবলীই অনুসরণীয় নহে; বরং কতক বিষয় তিনি নিজে না করিলেও উম্মতের জন্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। (ইহাকে তাঁহার বাগধারা বলিলে সঙ্গত হয়।) মোটকথা, হুযূরের অবলম্বিত কার্যাবলী অনুসরণ করিলে যেমন, مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ -এর দলভুক্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহার অনুমতিযুক্ত কার্যগুলি অবলম্বন করিলেও উক্ত দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, যদিও হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা না করিয়া থাকেন। উভয় প্রকারের কার্যই হুযূরের কার্যধারা অর্থাৎ, مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ -এর অন্তর্ভুক্ত এবং হকপন্থী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এই জাতীয় আচ্‌কান, চোগা, জুতা প্রভৃতি যদিও হুযূর (দঃ) নিজে ব্যবহার করেন নাই, এই প্রকারে জর্দা, পোলাও, কোরমা প্রভৃতি রুচিকর খাদ্য আহার করেন নাই, কিন্তু খাওয়া-পরার

ব্যাপারে তিনি উম্মতকে এরূপ প্রশস্ততার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, ছাহাবায়ে কেরাম অপেক্ষা উচ্চতর হকপন্থী আর কেহ ছিল না—ইহা সর্ববাদিসম্মত। এমন কি, তাঁহারা ছিলেন হুযূর (দঃ)-এর চাল-চলন এবং কার্যকলাপের মূর্ত প্রতীক। তাঁহাদের অনুসরণকে হুযূর (দঃ) পারলৌকিক মুক্তির উছিলা বলিয়াছেন। ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে দেখা যাইবে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামের উত্থানকালে ছাহাবাগণ খাওয়াপরার ব্যাপারে প্রশস্ততা অবলম্বন করিয়াছেন এবং নানাবিধ নেয়ামত উপভোগ করিয়াছেন। অথচ হুযূরের জীবিতকালে অর্থাৎ, ইসলামের প্রাথমিক সময় ইহা ছিল না। এতদ্ভিন্ন হুযূর (দঃ)-এর জীবদ্দশায় ইস্‌লামের প্রথম যুগে ও শেষের দিকে ছাহাবাগণের অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন এবং দরিদ্রাবস্থার পরে সুখ-শান্তির উপকরণ অবলম্বন করা একেবারে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। হুযূরের এন্তেকালের পরবর্তীকালের কথা তো দূরেই থাকুক। সুতরাং বুঝা গেল যে, শরীঅতের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া নানাবিধ নেয়ামত উপভোগ করা এবং সুখ-শান্তির উপকরণ অবলম্বন করার অনুমতি হুযূরের বাণী দ্বারাই প্রমাণিত আছে। অতএব, এতদনুযায়ী আমল করিলেও হকপন্থী দলের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিবে, যদিও ইহা হুযূরের বিশেষ কার্যধারার অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং যবের রুটি খাওয়া অবশ্যই হুযূরের কার্য সংক্রান্ত সুন্নত। সাধ্য থাকিলে এতদনুযায়ী আমল করা খুবই উচ্চ ধরনের, উত্তম এবং পছন্দনীয় কার্য। অবশ্য হুযূরের প্রত্যেক সুন্নত অনুযায়ী আমল করা প্রত্যেক লোকের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই মর্মে আমার একটি গল্প মনে হইয়াছে। একদিন হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শেবন্দী (রঃ) কোন কিতাবে ছাহাবায়ে কেরামের জীবন যাপন প্রণালী সম্বন্ধীয় একটি হাদীস দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহারা যব পিষিতেন এবং তন্মধ্যস্থিত মোটা খোসাগুলি ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া অবশিষ্ট ছাতু চালুনি দ্বারা চালা ব্যতীত এমনি গুলিয়া রুটি পাকাইয়া খাইতেন। যদিও ইতিপূর্বে এই হাদীসটি বারবার তাঁহার নজরে পড়িয়াছিল; কিন্তু অদ্য ঐ হাদীসটি পাঠ করিয়া তাঁহার মনে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল এবং বিশেষভাবে একথার প্রতি লক্ষ্য হইল যে, আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতি হুযূর (দঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় কেন হইবে না? আমরা আড়ম্বরপূর্ণ খাদ্য কেন গ্রহণ করিব? তৎক্ষণাৎ তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে বলিলেন ঃ "আজ হইতে আমরাও যবের আটা না চালিয়াই তদ্দ্বারা রুটি প্রস্তুত করিয়া খাইব।"

ফলত পরবর্তী দিন যবের রুটি ঐরূপেই প্রস্তুত হইল এবং তিনি ভক্ষণ করিলেন। সমস্ত শস্যের মধ্যে যেহেতু যবের খোসা সর্বাপেক্ষা শক্ত হইয়া থাকে, এদিকে না চালিয়া রুটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। কাজেই সকলেরই পেটে ব্যথা আরম্ভ হইয়া গেল এবং সকলে এত কষ্ট পাইলেন যে, পরবর্তী বেলায় আর তাহা খাইতে সাহস পাইলেন না।

আল্লাহু আক্‌বার! এই মহাপুরুষদের উচ্চ মর্যাদা এসমস্ত উক্তি হইতেই প্রকাশ পায়। আমাদের ন্যায় প্রবৃত্তির দাস হইলে সঙ্গে সঙ্গেই এরূপ কল্পনা হইত। কল্পনা কিসের? মুখ ফুটিয়াই বলিয়া ফেলিত ঃ "খুব ভাল সুন্নতই পালন করিলাম, যাহার ফলে পেট চাপিয়া বেড়াইতেছি। এরূপভাবে দুই চারিবার সুন্নত পালন করিলে সম্ভবত দুনিয়া ছাড়িয়াই যাইতে হইবে। আমরা এমন সুন্নত পালন হইতে বিরত রহিলাম।" কিন্তু তাঁহাদের 'আদব' দেখুন, ভবিষ্যতে যব খাওয়া তো বর্জন করিলেন, কিন্তু হুযূর (দঃ)-এর এই শ্রেণীর সুন্নতের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রহিল। তিনি নফস্‌মারা কঠিন হৃদয় পীরদের ন্যায় যবের রুটি খাওয়া অবধারিত করিয়া লইলেন না। গোঁড়া পীরেরা

অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা হইতে থাকিলেও যব খাওয়া ত্যাগ করিতেন না। হযরত খাজা সাহেবের গুণ এই যে, যবও আর খাইলেন না এবং সুন্নতের উপরও কোন দোষ আসিতে দিলেন না। তিনি উভয় বিষয়কে কেমন সুন্দরভাবে একত্রিত করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেনঃ আমি বেআদবী করিয়া ফেলিয়াছি। সর্বপ্রকারে হুযূর (দঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ইহা প্রকারান্তরে তাঁহাদের সহিত সমকক্ষতার দাবীই বটে, ইহা আমাদের নিছক ভুল হইয়াছিল। সেই ভুলের শাস্তি ভোগ করিলাম। সুন্নতের প্রতি কোন দোষারোপ হইতে পারে না; বরং প্রকৃতপক্ষে ত্রুটি আমাদেরই। অর্থাৎ, সেই উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে এবং উহা বরদাশ্‌ত করিতে আমাদের নফ্‌স অক্ষম। জীবন যাপনের এই পদ্ধতি ছাহাবায়ে কেরামেরই উপযোগী, তাঁহারাই উহা বর্‌দাশত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমাদের সেই লোভ করা উচিত নহে।

মাশায়েখে কেরামের কর্তব্যঃ মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

چار پارا قدر طاقت بار نه   بر ضعیفاں قدر همت کار نه

“চতুষ্পদ জন্তুর উপর উহার ক্ষমতানুযায়ী বোঝা চাপাও। দুর্বল লোক হইতে তাহার শক্তি অনুযায়ী কাজ লও।”

মাওলানা এই কবিতাটির মধ্যে শিক্ষা দিতেছেন যে, মুরশিদগণের উচিত শিষ্যগণ হইতে তাহাদের সাহস এবং শক্তি অনুযায়ী কাজ লওয়া, শক্তির অতিরিক্ত কাজের চাপ দেওয়া উচিত নহে। অন্যথায়ঃ

طفل را گر ناں دهی بر جائے شیر   طفل مسکین را ازاں نان مرده گیر

“স্তন্যপায়ী শিশুকে যদি দুধের পরিবর্তে রুটি খাইতে দেওয়া হয়, তবে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।”

শিশুকে দুধের পরিবর্তে রুটি খাইতে দেওয়ার অর্থ তাহাকে ধ্বংস করা। হাফেয শিরাযীও এই মর্মটুকু তাঁহার কবিতায় কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেনঃ

خستگاں را چوں طلب باشد وقوت نبود   گر تو بیداد کنی شرط مروت نه بود

“যে সমস্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থার লোকের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু শক্তি নাই, তাহাদের প্রতি যুলুম করা মনুষ্যত্বের বিপরীত হইবে।”

কেহ কেহ হাফেয শিরাযীর উপর বৃথা আক্রমণ করিয়া থাকেন যে, তিনি মদ্যপায়ী এবং মাতাল ছিলেন। তাঁহার উক্তি কেমন করিয়া আরেফানা হইবে? এরূপ প্রশ্ন তাহাদের ভুল এবং কু-মতলবের প্রমাণ। এরূপ প্রশ্ন বিশেষ করিয়া কেবল হাফেয শিরাযীকেই করা হয় নাই; বরং সমস্ত কামেল লোকের প্রতিই সর্বদা ইত্যাকার প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের মর্যাদার উপর কোন প্রকার দাগ পড়ে না; বরং তাঁহাদের মর্যাদা আরও ফুটিয়া উঠে। বুঝা যায়—তাঁহাদের জ্ঞান অতি উচ্চস্তরের এবং সাধারণ লোকের নাগালের বাহিরে। হযরত হাফেযের উক্তি হইতে তাছাওউফ শাস্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ মাস্‌আলা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। তাঁহার উন্নত মস্তিষ্কের প্রমাণ তাঁহার উচ্চস্তরের উক্তিগুলি হইতেই প্রকাশ পায়। একজন অনুপযুক্ত, অযোগ্য, মাতাল লোকের উক্তি হইতে তাছাওউফের এত মাসআলা আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব (রঃ) বলিতেনঃ “যে যেই ধরনের লোক তাহার ভিতর হইতে তাহাই নির্গত হয়।” অর্থাৎ, কাহারও উক্তি হইতে উচ্চস্তরের বিষয়বস্তু এবং জটিল মাসআলা তখনই বাহির করা যাইতে পারে, যখন তাহার ভিতরে সে সমস্ত বিষয়বস্তু ইচ্ছামূলকভাবে বিদ্যমান

থাকে। অন্যথায় কোন দুশ্চরিত্র মদ্যপায়ী লোকের উক্তি হইতে তুমি সেই শ্রেণীর বিষয়বস্তু বাহির কর তো? সুতরাং হাফেয শিরাযীর উক্তি হইতে এই শ্রেণীর তাছাওউফের মাসআলা আবিষ্কৃত হওয়াই তিনি মুরশিদে কামেল হওয়ার প্রমাণ। তিনি বলিতেছেন ঃ

خستگاں را چوں طلب باشد وقوت نبود   گر تو بیداد کنی شرط مروت نه بود

“যে সমস্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত লোকের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে শক্তি নাই, তাহাদের প্রতি অবিচার করা মানবতাবিরোধী।” ইহাও কঠোর স্বভাব মুরশিদদিগকেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, মুরীদগণের সহিত তাহারা যেন সহজসাধ্য আচরণ করেন। শক্তি এবং যোগ্যতা অনুযায়ী তাহাদিগ হইতে কাজ লন। এমন না হয় যে, তাহাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং মস্তিষ্ক বিগ্ড়াইয়া যায়। অতঃপর সে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে।

অনভিজ্ঞ মুরশিদের কার্যপদ্ধতি ঃ দেখুন, কোন ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ্ তাআলার মহব্বত লাভের আগ্রহে পরিপূর্ণ। তাহার অন্বেষণ হৃদয়ে উচ্চ পর্যায়ে বিদ্যমান। কিন্তু এতদসঙ্গে দুর্বলতা এবং বার্ধক্যের কারণে পিঠ কুঁজো হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য পথ চলিয়াই হাঁপাইয়া পড়ে। চব্বিশ হাজার বার আল্লাহ্ তাআলার ‘এসমে জালালী’ ওযীফা করিবার শক্তি নাই। সে যাইয়া কোন পীরের মুরীদ হইল। পীর ছাহেব তাঁহাকে বলিলেন ঃ দৈনিক চব্বিশ হাজার বার ‘এস্‌মে জালালী’র ওযীফা কর। সে বলিল ঃ “হযরত! ‘চব্বিশ হাজার বার’ জালালী নামের ওযীফা করিয়া আমি কোথায় থাকিব? এক দিনেইতো মরিয়া যাইব।” পীর ছাহেব বলিলেন ঃ “কোন ক্ষতি নাই, মরিলে শহীদ হইয়া যাইবে। খোদার অন্বেষণে লিপ্ত হইয়া তদবস্থায় মরিয়া গেলে শহীদ হওয়ার সওয়াব লাভ করিবে; বরং অতি উচ্চ স্তরের শহীদ হইবে।” পীর সাহেব, খুব ঠিকই বলিয়াছেন! বাস্তবিক এই ব্যক্তির শহীদ হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। সে তো অবশ্যই শহীদ হইবে। কিন্তু আপনি সাবধান থাকুন। তাহাকে শহীদকারী আপনিই। তাহার তো শহীদ হওয়ার ভাগ্য হইল। কিন্তু আপনার আমলনামায় একটি ইচ্ছাকৃত হত্যার মহাপাপ লিখিত হইল এবং আপনি হত্যাকারী আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

দিল্লী নগরীতে এক পীর ছাহেব ছিলেন। তিনি সমস্ত মুরীদকে একই ছড়ি দ্বারা শাসন করিতেন। দুর্বল-সবলের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখিতেন না। তাঁহার দরবারে যুবক-বৃদ্ধ সকলের জন্য একই ওযীফা ছিল। এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার মুরীদ হইল। পীর ছাহেব তাহাকে “ছালাতে মা’কূস” শিক্ষা দিলেন। লোকটি পীর ছাহেবের নির্দেশ অমান্য করার যোগ্য মনে করিল না, পীর ছাহেবের শিক্ষানুযায়ী “ছালাতে মা’কূস” পড়িল এবং তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারটি পীর ছাহেবের কর্ণগোচর করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ “কোন ক্ষতি নাই, ভালই হইয়াছে, শহীদ হইয়াছে, নফ্‌সের পবিত্রকরণ পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছে।”

ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা বলিতেছি। এক চিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অন্ধ ও অনভিজ্ঞ ছিল। তাহার নিকট এক রোগী আসিল। তিনি তাহাকে জোলাবের ব্যবস্থা করিয়া খুব কড়া ঔষধ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন ঃ ঘরে যাইয়া সেবন কর, ইহাতে দাস্ত হইবে। রোগী বাড়ী যাইয়া ঔষধ সেবন করা মাত্র দাস্ত হইতে আরম্ভ করিল। যখন দাস্তের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক হইয়া গেল, তখন গৃহবাসীরা অস্থির হইয়া হাকীম ছাহেবের নিকট গিয়া বলিল ঃ হুযূর! অনর্গল দাস্ত হইতেছে। রোগী ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। তিনি বলিলেন, এখনই কি হইয়াছে। ইহা জোলাব। হাসি-তামাশা নহে। দাস্ত হইবেই এবং দুর্বলতাও বাড়িবে। তোমরা ভয়

পাইতেছ কেন ? পরে আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহারা নীরবে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ আরও অপেক্ষা করা হইল, কিন্তু দাস্ত এমন তীব্রভাবে আরম্ভ হইয়াছে যে, বন্ধ হইবার নামই নাই। অনেকক্ষণ পরেও যখন পায়খানা বন্ধ হইল না, তখন তাহারা ভীষণ ভয় পাইয়া গেল। পুনরায় হাকীম ছাহেবের নিকট গিয়া বলিলঃ এতক্ষণ হইয়া গেল, দাস্ত এক মিনিটের জন্যও বন্ধ হইতেছে না। রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। তিনি উত্তর করিলেন, রোগীর আগে তোমাদেরই তো প্রাণ বাহির হইতেছে দেখিতেছি। আরে ভাই! দাস্ত হইতেছে—ভালই তো কথা। অনিষ্টকারী মল বাহির হইয়া যাইতেছে। এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে সারা জীবন কষ্ট দিবে। তাহারা আবার নীরবে চলিয়া গেল। কিন্তু দাস্ত বন্ধ হইল না। অবশেষে রোগীর প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তাহারা হাকীমকে জানাইল। দাস্ত বন্ধ হইবার ছিল না, বন্ধ হইল না। শেষ পর্যন্ত রোগীই চলিয়া গেল। হাকীম বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ অনিষ্টকারী পদার্থ বাহির হইয়াও এরূপ হইল! দাস্ত বন্ধ হইলে খোদা জানেন, কি অবস্থা হইত। এই বেওকুফকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত যে, মৃত্যুর উপরে আর কোন্ অবস্থা ছিল—দাস্ত বন্ধ না হইলে যাহা ঘটিতে পারিত ? মানুষের শেষ অবস্থা হইতেছে মৃত্যু। দাস্ত বন্ধ হইলেও খুব বেশী হইলে মৃত্যুই ঘটিত। অতএব, এই বেওকুফ হাকীম যেমন এই রোগীর মৃত্যুর কারণ; বরং হত্যাকারী হইয়াছে, তদ্রূপ উপরোক্ত মুরীদ যদিও শহীদ হইয়াছে, কিন্তু মুরশিদের আমলনামায় এক অন্যায় হত্যার বিশ্রী দাগ লাগিয়াছে, যাহা মুছিয়া ফেলিলেও নিশ্চিহ্ন হইবার নহে।

ফলকথা, হাফেয শিরাযী এই কবিতায় এই শ্রেণীর কঠোর স্বভাব মুরশিদকে যালেম এবং এই ধরনের কার্যকে অবিচার ও মনুষ্যত্ব বিরোধী মনে করিয়াছেন।

বন্ধুগণ, বাস্তবিকই ইহা বড় যুল্‌ম। এই ধরনের মুরশিদগণ মুরীদের অবস্থার প্রতি একটুও লক্ষ্য করেন না; বরং সকলের উপর একই ছড়ি ঘুরাইতে থাকেন। দুর্বল এবং সবল সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন।

কামেল পীরের কার্যধারাঃ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের কার্যপ্রণালী কেমন অনুগ্রহপূর্ণ ছিল! তাঁহাদের দরবারে সর্বপ্রথম নিয়ম এই ছিল যে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও শক্তিশালী মুরীদকে পূর্ণমাত্রায় এস্‌মে যাতের ওযীফা তা'লীম দিতেন। দুর্বল কিংবা কর্মব্যস্ত হইলে শক্তি ও অবসর অনুযায়ী তা'লীম দিতেন। কাহাকেও দশ হাজার বার, কাহাকেও বা পাঁচ হাজার বার, কাহাকেও বা পাঁচ শত বার। শক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক মুরীদ হইতে কাজ আদায় করিতেন। কঠোরতা পছন্দ করিতেন না। আমার পীর ছাহেব বলিতেনঃ আজকাল তোমরা যে দেখিতেছ, মসজিদে প্রত্যেক নামাযের পর মুছল্লিগণ সালাম ফিরাইয়া তিনবার لَآ اِلٰهَ। اِلَّا। اللهُ যেকের করিয়া থাকে, ইহার তাৎপর্য এই যে, কোন পীর নিজের কোন দুর্বল মুরীদকে তা'লীম দিয়াছিলেনঃ 'তুমি আর অধিক কি পারিবে ? প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার এই যেকের করিও।' দুনিয়ার দস্তুর এই যে, খরবুযা দেখিয়া খরবুযার রং পরিবর্তিত হয়। লোকেরা তাহাকে দেখিয়া এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। দুর্বল-সবল নির্বিশেষে সকলেই এইরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই যেকেরও যেন দুনিয়ার অন্যান্য প্রথার ন্যায় একটি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই তাহা পালন করিতেছে। প্রকৃত বস্তু লোপ পাইয়াছে। বস্তুত দুনিয়ার অবস্থাই এইরূপ হইয়াছে যে, আসল বস্তু লোপ পাইয়া 'রস্‌ম' (প্রথা) অবশিষ্ট রহিয়াছে। মূলত দুর্বল মুরীদদের অবস্থার পরিলক্ষিতে ইহার সূচনা হইয়াছিল। এই রুচি সম্পর্কে আমাদের পীর ছাহেব একটি কবিতা বলিয়াছেনঃ

گرچه کرتے هیں بهت سے ناله وفریاد هم
بس هے اپنا ایك ناله بهی اگر پهنچے وهاں

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যলাভের জন্য একবার 'আল্লাহ্' বলাই যথেষ্ট। অধিক পরিমাণে যেকের করার উপর উহা নির্ভর করে না; বরং তোমার সাহস ও শক্তি পরিমাণ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। শক্তির বাহিরে কিছু করিতে যাইও না।" মোটকথা, হুযূরের তা'লীম খুবই সহজ ছিল, মুরীদের তাহাতে কোন প্রকার কষ্ট হইত না। খুব আনন্দের সহিত ওযীফা এবং যাবতীয় কার্য সমাধা করিতে পারিত। আমি তো তাঁহার তা'লীম দেখিয়া বলিতামঃ

بهار عالم حسنش دل و جاں تازه می دارد   برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب معنی را

"কাহাকেও হাল্কা-পাতলা রাখিতেন, সে হাসিতে-খেলিতে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া যাইত। কাহাকেও অতিরিক্ত কাজের চাপে জড়াইয়া রাখিতেন। সে হাল এবং অপরূপ অবস্থার মধ্যে ডুবিয়া থাকিত।"

بگوش گل چه سخن گفتهٔ که خنده است   بعندلیب چه فرمودهٔ که نالاں ست

"ফুল হাসিতেছে, বুলবুল কাঁদিতেছে, জানি না তুমি উহাদের কানে কানে কি বলিয়া দিয়াছ?"

তাঁহার দরবারে এমন কোন অবধারিত নিয়ম ছিল না, যাহা মানিয়া চলা সকলের জন্য অপরিহার্য হইত এবং যাহার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক হইত; বরং যাহার জন্য যেরূপ উপযোগী মনে করিতেন, তা'লীম দিতেন। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় ইহাতেই পাওয়া যাইত যে, যাহাকে সামান্য কাজ তা'লীম দিতেন, ইহাই তাহার জন্য এত উপকারী হইত যে, সেই সামান্য কাজেই তাহার সমস্ত দোষ-ত্রুটি সংশোধন হইয়া যাইত। আর কোন ওযীফা বা আমলের প্রয়োজন হইত না। আল্লাহু আকবার! বাস্তবিকই ইহা বড় কঠিন কাজ এবং ইহার জন্য বড় তত্ত্বজ্ঞানী লোকের প্রয়োজন। সকলকে একই ছড়ি দ্বারা তাড়া করা অনভিজ্ঞতার প্রমাণ।

যেমন—কোন কোন ডাক্তার সর্বপ্রকার জ্বরের জন্যই কুইনাইন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। চিন্তা করিয়া দেখেন না—কোন্ প্রকারের জ্বর, মওসুমী জ্বর না আবহাওয়ার কারণে, রোগীর প্রকৃতি গরম না স্বাভাবিক, দুর্বলতা কি পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া জ্বর দেখিলেই এক কুইনাইনেরই ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞ ডাক্তার প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ নির্বাচন করিয়া থাকেন। কুইনাইন উপযুক্ত মনে করিলে ব্যবস্থা দিবেন, অন্যথায় দিবেন না কিংবা দিলেও উহার সংশোধক কোন ঔষধ সঙ্গে মিশাইয়া দিবেন। যাহাতে রোগীর কোন ক্ষতি না হয়। এইরূপে মুরীদের সর্ববিধ অবস্থা পূর্ণরূপে অবগত হইয়া তদনুযায়ী তা'লীম দেওয়া খুব তত্ত্বজ্ঞানী কামেল পীরের কাজ।

অতএব, কোন কঠোর স্বভাব পীর—যিনি মুরীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ক্ষতিকর মনে করেন, তিনি এখানেও বলিতেন, ব্যথা হউক কিংবা মরুক, যব খাওয়া ছাড়িতে পারিবে না। প্রাণ গেলেও নবী (দঃ)-এর সুন্নত ত্যাগ করা চলিবে না। মরিলে শহীদ হইবে। আমাদের জন্য দৃঢ়তার উপর আমল হইল—যব খাওয়া এবং উঃ পর্যন্ত না করা।

জনৈক মৌলভী ছাহেব রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নামাযের সময় হইলে তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনে প্লাটফরমে নামায পড়িতে ইচ্ছা করিলেন। সহযাত্রীরা বলিলঃ হুযূর! এই ষ্টেশনে গাড়ী বেশীক্ষণ থামিবে না। আপনি ভিতরেই নামায পড়ুন। তিনি বলিলেনঃ বাঃ! ইহা কেমন কথা যে, চলমান গাড়ীতে নামায! গাড়ী যাউক বা থাকুক আমি নীচে নামিয়াই

নামায পড়িব। সকল যুগেই এরূপ কঠোর প্রকৃতির গোঁড়া কিছু লোক বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞানীও হইয়া থাকেন, তাঁহারা এরূপ অবস্থায় বলেন ঃ গাড়ীর ভিতরে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলেও যেরূপে সম্ভব হয়, নামায গাড়ীতেই পড়িয়া লইতে হইবে। কিন্তু ভিড়ের জন্য রুকূ-সজ্‌দা করিতে না পারিয়া ইশারায় নামায আদায় করিলে সাবধানতার জন্য তাহা অবশ্যই পুনরায় যথারীতি পড়িয়া লইতে হইবে। উক্ত গোঁড়া মৌলভী ছাহেবের ন্যায় গাড়ী হইতে নামিয়া নামায পড়িতে হইবে না।

আমলে 'আযীমত' এবং 'রোখ্‌ছত'ঃ উক্ত গোঁড়া লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, 'আযীমত' অর্থাৎ, খোদা প্রদত্ত সহজ পন্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আদি নির্দেশ দৃঢ়তা সহকারে পালন করাই শরীঅত বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে সওয়াবও অধিক হয়। পক্ষান্তরে 'রোখ্‌ছত' অনুযায়ী অর্থাৎ, সহজ পন্থা অবলম্বনে আমল করিলে সওয়াব কম হয়। সুতরাং সহজ পন্থার বিধান থাকিলেও তাঁহারা তদনুযায়ী আমল করেন না। মনে করেন, এই সহজ পন্থার বিধান একান্ত অসুবিধার সময় সাধারণ লোকের জন্য বটে, যেন তাহারা শরীঅত বিধানের কঠোরতায় সংকীর্ণমনা না হয়। আমরা তো খাছ লোক। অযথা কেন সহজ পন্থা অবলম্বনপূর্বক নিজেকে সওয়াব কম পাওয়ার উপযোগী করিব? ইহা তাহাদের মহাভুল। কেননা, শরীঅতসম্মত সহজ পন্থাকে তাহারা আসল বিধান মনে করে না; বরং উহাতে সওয়াব কম হয় বলিয়া মনে করে। অথচ এরূপ ধারণা ফেকাহশাস্ত্রের বিপরীত। এই মাসআলায় সকলেই একমত যে, আযীমত ও রোখছত যথাস্থানে প্রযুক্ত হইলে উভয়ের সওয়াবই সমান। কেননা, উভয়ই শরীঅতের বিধান এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ নির্দিষ্ট অবস্থায় শরীঅতের আসল নির্দেশ।

যদিও কেহ কেহ ধারণা করেন যে, খাছ লোকের পক্ষে রোখছত অনুযায়ী আমল করার চেয়ে আযীমত অনুযায়ী আমল করাই উত্তম। কিন্তু আমার মতে খাছ লোকের জন্যও রোখ্‌ছতের ক্ষেত্রে তদনুযায়ী আমল করাই আযীমত অনুযায়ী আমল করা অপেক্ষা অধিক সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কেননা, খাছ লোকের কার্যপ্রণালীকে সাধারণ লোকেরা আদর্শস্থানীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে। যাবতীয় কার্যে এবং এবাদতে তাহারা খাছ লোকেরই অনুসরণ করে। অতএব, রোখছতের ক্ষেত্রে খাছ লোকেরা যদি তদনুযায়ী আমল না করিয়া আযীমত অনুযায়ী করে এবং সাধারণ লোককে রোখছত বা সহজ পন্থা অবলম্বন করিতে বলে, তবে তাহারা মনে করিবে, ইঁহারা যাহা করিতেছেন সম্ভবত ইহাই শরীঅতের আসল নির্দেশ। কেবল আরামের জন্য আমাদিগকে সহজ পন্থানুযায়ী আমল করিবার উপদেশ দিতেছেন। ইহাতে আমাদের বেশ আরাম হইল। একদিকে কাজে যে পরিমাণ আরামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অপর দিকে সওয়াব সেই পরিমাণই কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন তাহারা গোলকধাঁধায় পতিত হয় এবং ভাবে, আযীমত অনুযায়ী আমল করিলে কষ্টে পতিত হইব, যদিও সওয়াব বেশী পাইব। পক্ষান্তরে সহজ পন্থা অবলম্বন করিলে কষ্ট কিছুটা লাঘব হইবে বটে; কিন্তু প্রচুর সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইব। এমতাবস্থায় তাহাদের মনে এরূপ খটকা হইবে যে, এমন লঘুতার চেয়ে কঠোর পন্থাই অধিক উত্তম ছিল। কেননা, তাহাতে কষ্ট-ক্লেশ থাকিলেও একাগ্রতা এবং শান্তি থাকিত। এখন তো দ্বিধার সৃষ্টি হইল যে, এই সহজ পন্থা অবলম্বন করিব বা না করিব, মনে হয় যে, শরীঅত আমাদের সুবিধা ও হিতের পূর্ণ ব্যবস্থা করে নাই। কাজেই সাধারণ মানুষকে ইত্যাকার সন্দেহ হইতে রক্ষা করা এবং তাহাদের ধর্মবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ ও নিরাপদ রাখার জন্য খাছ লোকের পক্ষেও রোখছত অর্থাৎ, সহজ পন্থা অনুযায়ী আমল করাই সঙ্গত। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বিশিষ্ট লোকেরা মূলত বৈশিষ্ট্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই আযীমত

অনুযায়ী কার্য করা পছন্দ করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সমস্ত খাছ লোকের শিরোমণি। আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকিতেন। কঠিন হইতে কঠিনতম কার্যও তাঁহার নিকট অতি সহজ ছিল এবং অতি উচ্চ পর্যায়ের কষ্টকর কার্যও তাঁহার জন্য সহজসাধ্য ছিল। তিনি তো রোখছতের ক্ষেত্রে রোখছতের পন্থাই অবলম্বন করিতেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا

"রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই বস্তুর যেকোন একটি অবলম্বনের অনুমতি দেওয়া হইলে তিনি সহজতর বস্তুকেই অবলম্বন করিতেন।" ছাহাবায়ে কেরাম কখনও কখনও রোখছতযুক্ত কার্যকে সহজ দেখিয়া ধারণা করিতেন, হুযূরের মরতবা অতি উচ্চ, কষ্ট করার প্রয়োজন তাঁহার নাই। অতএব, সম্ভবত বিশেষ করিয়া তাঁহাকেই এই রোখছত প্রদান করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য, আমাদের মধ্যে সেই বিশেষত্ব নাই। কোথায় আল্লাহ্র রাসূল, আর কোথায় আমরা! چه نسبت خاک را با عالم پاک "পবিত্র জগতের সহিত মাটির দুনিয়ার কি সম্পর্ক?" সুতরাং আমরা এই সহজ পন্থার যোগ্য নহি। আমাদের অধিক পরিশ্রম এবং কষ্ট করা উচিত। এই ধারণায় তাঁহারা রোখছত অনুযায়ী আমল করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আযীমত অনুযায়ী আমল করিতে মনস্থ করিলেন। হুযূর (দঃ) তাঁহাদের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া বলিলেনঃ

مَابَالُ اَقْوَامٍ يَّتَنَزَّهُوْنَ عَمَّا اَصْنَعُهُ فَوَاللهِ اِنِّىْ لاَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهٗ خَشْيَةً

"মানুষের কি হইল, যে কাজ আমি করি তাহা হইতে তাহারা দূরে থাকে? আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে তাহাদের অপেক্ষা আমার জ্ঞান অনেক বেশী এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে তাহাদের অপেক্ষা আমি অধিক ভয় করি।" —বোখারী, মুসলিম

কোন কোন ছাহাবীর অনুরূপ উক্তি ও সংকল্পের ব্যাপারে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا اَمَا وَاللهِ اِنِّىْ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهٗ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاَفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ○

"তোমরাই কি এরূপ বলিয়াছ? সাবধান! আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্কে তোমাদের চেয়ে আমি অধিক ভয় করি। তাঁহার নির্দেশ তোমাদের চেয়ে আমি অধিক পালন করি, কিন্তু আমি কখনও রোযা রাখি, কখনও রাখি না, কখনও রাত্রি জাগিয়া এবাদত করি, কখনও ঘুমাই এবং কখনও স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত হইতে বিমুখ থাকিবে, সে আমার দলে নহে।"
—বোখারী, মুসলিম

ফলত হুযূরের নির্দেশে ছাহাবায়ে কেরাম রোখছত অনুযায়ীই আমল করিয়াছেন। অতএব, স্বয়ং নবী করীম (দঃ) যখন রোখছত অনুযায়ী আমল করিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দেশে ছাহাবায়ে কেরামও করিয়াছেন, তখন তথাকথিত খাছ লোকের পক্ষে রোখছত অনুযায়ী আমল করা অপেক্ষা আযীমত অনুযায়ী আমল করা উত্তম বলিয়া ধারণা করা প্রকাশ্য ভুল। কেহ কি এরূপ ধারণা করিতে পারে যে, হুযূর (দঃ) কিংবা ছাহাবায়ে কেরাম কষ্টকর কার্য করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন? কিংবা কষ্টজনক কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করিতেন? ধারণা তো দূরের কথা

এমন কল্পনা করাও মহা পাপ। সুতরাং বুঝা যায়, রোখছতের ক্ষেত্রে তদনুযায়ী আমল করাই শরীঅতের আসল বিধান। অতএব, প্রত্যেক যুগের খাছ লোকের উচিত শরীঅতের বিধানানুযায়ী রোখছতের ক্ষেত্রে নিজেরাও আমল করিয়া লাভবান হওয়া এবং অপরকেও সেই তা'লীম দেওয়া, যেন তাহারাও আল্লাহ্ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করিতে পারে। এরূপ ধারণা করিবেন না যে, রোখছত শরীঅতের আসল বিধান নহে এবং এমন ধারণা অপরের মনেও উৎপত্তি হইতে দিবেন না। কথায়ও নহে কাজেও নহে, যাহার ফলে শরীঅতের বিধান অনুযায়ী আমল করিতে লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং একান্ত আনন্দিত ও প্রশান্ত চিত্তে শরীঅতের নির্দেশ গ্রহণ করে।

দেওবন্দ শহরে দুইজন বুযুর্গ ছিলেন—আকবর ও কবীর। আকবর অন্তিম পীড়াকালেও ওযূ করিতেন। কবীর তাঁহাকে বলিলেন ঃ এমতাবস্থায় আপনি কেন ওযূ করেন, আপনার জন্য তো তায়াম্মুমের অনুমতি রহিয়াছে, আপনি তায়াম্মুম করুন। তাহা হইলে এই কষ্ট হইতে নাজাত পাইবেন। তিনি বলিলেন ঃ আমি আযীমত অনুযায়ী আমল করিতেছি। কবীর বলিলেন ঃ মাওলানা! তায়াম্মুমকে পবিত্রতা সাধনে ওযূর সমকক্ষ মনে করেন না বলিয়াই আপনি ওযূ করিতেছেন। মূলত আপনার এই কার্যে শরীঅতের উপর প্রশ্ন আসে যে, শরীঅত আমাদিগকে একটি ত্রুটিপূর্ণ কার্যের বিধান দিয়াছে। এই ধারণায় আযীমত অবলম্বন করিলে সওয়াবের যোগ্য হওয়া যায় না। ইহাতেই তিনি বুঝিয়া গেলেন এবং রোখছত অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

অতএব, দেখুন, রুগ্নাবস্থায় তায়াম্মুম করার রোখছত ছিল, উক্ত বুযুর্গ লোক তদনুযায়ী আমল না করিয়া ওযূকেই শরীঅতের আসল বিধান মনে করিয়া আযীমতের উপর আমল করিতেছিলেন, অথচ কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ কষ্টের ক্ষেত্রে তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়, এরূপ ক্ষেত্রে তায়াম্মুমই ওযূর কাজ দিবে। অর্থাৎ ওযূর দ্বারা যেমন পূর্ণ পবিত্রতা সাধিত হইত, তায়াম্মুম দ্বারাও তাহাই হইবে।

শোক্‌রের তওফীক ও উহার প্রণালী ঃ দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদানের পর উহার কারণস্বরূপ বলিয়াছেন ঃ وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ "আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে পবিত্র করিতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার নেয়ামত পূর্ণ করিতে।" ইহাতে বুঝা যায়, তায়াম্মুম দ্বারা ওযূর ন্যায় পূর্ণ পবিত্রতাও লাভ হয় এবং ইহাতে অতিরিক্ত আরও একটি নেয়ামতও রহিয়াছে। এমতাবস্থায় ওযূর মধ্যে তাহা নাই। অর্থাৎ, নেয়ামত পূর্ণ করা। যেন পবিত্রতার সাথে সাথে নেয়ামত পূর্ণ করাও উদ্দেশ্য। এই নেয়ামত পূর্ণ করার দরুনই শোক্‌র করিবার নির্দেশ হইয়াছে— لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ রোখ্‌ছত প্রদানের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম রহস্য এবং ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুমের রোখ্‌ছত প্রদানের মধ্যে তোমাদের প্রতি নেয়ামত পূর্ণ করাও আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমরা অন্তরের সহিত শোকর করিবার তওফীক লাভ কর। কেননা, তায়াম্মুম আমার একটি নেয়ামত ও অনুগ্রহ। তোমরা তায়াম্মুমের সুযোগ লাভ করিলে ইহাকে নেয়ামত মনে করিয়া অবশ্যই আমার শোক্‌র করিবে। সোব্‌হানাল্লাহ্! কেমন দয়া এবং অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কষ্ট দেখিতে পারেন না। ওযূ করিলে ইহা কোথায় পাওয়া যাইত? আমাদের হাজী ছাহেব (রঃ) বলিতেন ঃ "মিয়া আশরাফ আলী! তৃষ্ণার সময় গরম পানি পান না করিয়া খুব শীতল পানি পান করিও। গরম পানি পান করিলে যদিও মুখে আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ বলিবে, কিন্তু অন্তর ইহাতে অংশগ্রহণ করিবে না। ইহাতে শোক্‌রের হক আদায় হইবে না। পক্ষান্তরে ঠাণ্ডা পানি পান করিলে শুধু মুখ হইতেই

আল্হাম্দুলিল্লাহ্ বাহির হইবে না ; বরং প্রত্যেকটি লোমকূপ হইতেও বাহির হইবে। মন প্রফুল্ল হইবে, অন্তর উৎফুল্ল হইবে।” ফলকথা, এমতাবস্থায় যে শোক্‌র আদায় হইবে, তাহা অতি উচ্চস্তরের শোকর হইবে।

এইরূপে যখন ওযূ করাতে খুব কষ্ট হইবে বলিয়া নিশ্চিত বিশ্বাস হয় এবং মন ওযূ করিতে ভয় পায়, এমন সময় তায়াম্মুম করিলে মনে কেমন আনন্দ হইবে ? কেমন শোক্‌র আদায় হইবে ? বলাবাহুল্য, তায়াম্মুমের রোখছতের দরুন ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। বিভিন্ন প্রকার কষ্ট হইতে মুক্তি পাওয়া গেল। যদিও ওযূ করাও সম্ভব ছিল, যাহা হয়তো দেখা যাইত, কিন্তু মনের ভয় এবং রোগ বৃদ্ধির প্রবল ধারণা মনকে অস্থির করিবার জন্য যথেষ্ট ছিল। মোটকথা, তায়াম্মুমের সময় তায়াম্মুম করিলে অন্তর হইতে অনিবার্যরূপে শোক্‌র আসে। শুধু এক শোক্‌র নহে; বরং প্রত্যেকটি স্নায়ু হইতে, প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস হইতে আল্লাহ্‌র শোকরই আদায় হয়।

ইহা অভিজ্ঞতার কথা এবং চাক্ষুষ ব্যাপার। শোক্‌র মহব্বত বৃদ্ধি করে। কেননা, শোক্‌র আসে নেয়ামত ও অনুগ্রহের বিনিময়ে। বলাবাহুল্য, অনুগ্রহ এবং নেয়ামত প্রত্যক্ষ করাই নেয়ামতদাতা ও নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধির প্রধান উছিলা। সুতরাং শোক্‌রও মহব্বত বৃদ্ধির কারণ বটে। বস্তুত আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভ করাই প্রত্যেক মানুষ এবং তরীকতপন্থীর উদ্দেশ্য। কাজেই আল্লাহ্‌র মহব্বত বৃদ্ধি পাওয়াও রোখছত প্রদানের অন্যতম কারণ ও যুক্তি।

বিপদের বিভিন্ন প্রকার : কিন্তু ইহাতে এরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে না যে, মসিবত দ্বারা কি মহব্বত বৃদ্ধি পায় না ? কেননা, বিপদগ্রস্ত আরেফগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মসিবতেই তাঁহারা অন্তরে মহব্বতের উন্নতি উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে, মসিবতও মহব্বত বৃদ্ধির কারণ হয়। কিন্তু সর্বপ্রকারের মসীবতে তাহা হয় না, বরঞ্চ কোন কোন মসিবতে মহব্বত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এখন বুঝিয়া লওয়া দরকার, মহব্বত বৃদ্ধিকারী মসিবত চিনিবার মাপকাঠি এবং মহব্বত বৃদ্ধিকারী মসিবত ও উহার বিপরীতের প্রভেদ জানিবার উপায় কি ? দেখুন, মসিবত দুই প্রকার। (১) আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আগত মসিবত ; ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই ; বরং ইহার উৎপত্তিস্থল একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। এই শ্রেণীর মসিবত বাস্তবিক সর্বদা খোদা প্রেমিকদের মনে মহব্বত বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মাতা-পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হইলে তাঁহারা স্বাভাবিক দুঃখিত হন বটে ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাঁহাদের যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে না ; বরং ইহা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। কেননা, তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, মৃত ব্যক্তির হায়াত আল্লাহ্ তা'আলা এই পরিমাণই নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহার মৃত্যু এই সময়ের সহিতই সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অতএব, স্বাভাবিক সময়ই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

আর এক প্রকারের মসিবত আছে, যাহা মানুষ নিজের কর্মফলে আনিয়া থাকে। সে অথবা তাহার কার্য মসিবত আসিবার কারণ হয়। এই শ্রেণীর মসিবত মহব্বত বৃদ্ধির কারণ হয় না।

সুতরাং তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার সময় তাহা না করিয়া কেহ যদি ওযূ করে এবং মনে করে যে, ইহা কষ্টকর কাজ, ইহাতে নফ্‌স্ কষ্ট পায়, কাজেই ইহাতে খোদার মহব্বত বৃদ্ধি পাইবে। কেহ কেহ এরূপ ক্ষেত্রে বলিয়াও বেড়ায়, “ভাই, আমি এখন কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ওযূ করিয়াছি। বড় ভাল লাগিয়াছে, মন আনন্দিত হইয়াছে। অন্তর আলোকিত হইয়াছে।” তাহার বুঝা উচিত, ইহা নফ্‌সের ধোঁকা। মানুষ এই আনন্দকে খোদার মহব্বতের আনন্দ মনে করিয়া থাকে। অথচ ইহা

শুধু নফ্‌সেরই উপভোগ্য আনন্দ। এই আলো আত্মগর্বজনিত আলো। ইহাও নফ্‌সের এক বড় রকমের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি যে, আত্মগর্বের আলোকে খোদার আলো এবং নফ্‌সের আনন্দকে খোদার মহব্বতজনিত আনন্দ বলিয়া প্রকাশ করে। অথচ ইহার উৎপত্তিস্থল আত্ম-অহঙ্কার। অন্যথায় প্রকৃত আনন্দ উহাই, শরীঅত বিধানানুযায়ী কার্য করিয়া যে আনন্দ ও খুশীর লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাই সত্যিকারের 'নূর', যাহাকে খোদার মহব্বত বলা হয় এবং ইহাই তরীকতপন্থীর উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে নফ্‌সের ধোঁকায় পতিত ব্যক্তি এখানেও বলিত, যবই খাও—যদিও মৃত্যুই হউক। এই মৃত্যুতেও সুখ, জীবনের যাবতীয় সুখ হইতে ইহা উত্তম। ইহাতে এমন স্বাদ পাইবে যে, সারা জীবনে ইহার আনন্দ বিলুপ্ত হইবে না। আল্লাহ্‌র মহব্বতে অন্তররাজ্য আলোকিত হইবে। কিন্তু জনাব! আপনি কি জানেন? ইহার ফল কি হইবে? কেবল ইহাই হইবে যে, কয়েকদিন আমল করার পর সুন্নতের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিবে। আমল করা ব্যতীত এমনি সুন্নতের প্রতি পূর্বে যেই ভক্তি ছিল, সে ভক্তিও থাকিবে না। অতএব, এই সুন্নত পালনই সুন্নত বর্জন এবং উহার প্রতি বিতৃষ্ণার কারণ হইয়া যাইবে। অতএব, ইহার কুফল বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে।

আযীমত এবং রোখ্‌ছতের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত ঃ এখন আরও সূক্ষ্ম কথা আমার মনে পড়িয়াছে, যদ্দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ বিস্তারিত জ্ঞান লাভ হইবে। দেখুন, কেহ আযীমত অনুযায়ী আমল করিয়া কঠিনতম কার্য অবলম্বন করিল। ইহার অনিবার্য ফল এই হয় যে, সে উক্ত কার্য সমাধা করিয়াই ফলের প্রতীক্ষা আরম্ভ করিয়া দেয় এবং উচ্চ পর্যায়ের ফলই কামনা করিতে থাকে। অর্থাৎ, সে মনে করে, আমার পরিশ্রমের পরিমাণ এবং কাজের দুঃসাধ্যতা তো সুস্পষ্ট। সুতরাং পরিশ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে আমার যথার্থ ফল লাভ করা উচিত। পক্ষান্তরে রোখছত অনুযায়ী সহজতম কার্য অবলম্বনকারী কার্যশেষে ফলের মুখাপেক্ষীও থাকে না এবং কোন নির্দিষ্ট ফলের প্রত্যাশীও থাকে না। কেননা, সে এতটুকু উপলব্ধি করিতে থাকে যে, আমি এমন কি কাজই করিয়াছি? আমি তো রোখছত অনুযায়ী আমল করিয়াছি এবং সহজ ও সুবিধাজনক পন্থা তালাশ করিয়াছি। অতএব, কাজই যখন কিছু করি নাই, তখন ফলই কি পাইব?

মনে করুন, এক ব্যক্তি পাঁচ হাজার বা দশ হাজারবার এস্‌মে-যাতের ওযীফা করিতে থাকে। তৎসঙ্গে রীতিমত ঘুমায়ও, পানাহারও করে, পার্থিব অন্যান্য কাজকর্মও করে। মোটকথা, সে এসমস্ত কাজ এমন আরামের সহিত করে যে, নফ্‌সের নিকট মোটেই কষ্টকর হয় না। আর এক ব্যক্তি অনেক বেশী মাত্রায় এস্‌মে-যাতের ওযীফা করে, অন্যান্য নফল এবাদতও করে, ঘুমায়ও না, পানাহারও কেবল জীবন রক্ষা পরিমাণ করে, পার্থিব কাজ-কর্ম করে না। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াছে। ফলকথা, খুব উচ্চ পর্যায়ের মা'রেফাতের পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সর্বপ্রকারের নফল ও প্রয়োজনীয় কার্য খুব নিয়মানুবর্তিতার সহিত করিতেছে। শেষোক্ত ব্যক্তি নিজের প্রত্যেকটি কার্যের ও পরিশ্রমের পরেই বিরাট বিরাট ফল এবং প্রচুর পুরস্কারের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। শুধু প্রতীক্ষাই নহে; বরং সে নিজেই নিজের পরিশ্রমের বিচার করিয়া ফল ও পুরস্কার নির্ণয় করিয়া ফেলে। অর্থাৎ, আমার কাশ্‌ফ্ হউক, নানাবিধ দৃশ্য ও অবস্থা অন্তরে প্রকাশিত হউক, উচ্চ মর্যাদা লাভ হউক। যতই প্রতীক্ষার মুদ্দৎ দীর্ঘ হইতে থাকে এবং তাহার কল্পিত ফল লাভে বিলম্ব ঘটিতে থাকে, ততই এই ব্যক্তির মন বিরক্ত হইতে থাকে এবং মনে করে, আমার কার্যের বিনিময়ে যেই ফল পাওয়া উচিত ছিল, যাহার আমি উপযোগী ছিলাম, তাহা পাইলাম না। যোগ্যতার চেয়ে কম আমাকে দেওয়া হইয়াছে। যোগ্যতার বিচার করা হয় নাই।

পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত ব্যক্তি কোন কিছুর প্রতীক্ষা করিবে না। সে মনে করিবে, 'আমি কিই-বা করিয়াছি যে, পুরস্কার পাইব কিংবা ইহার কোন ফলাফল নির্ধারিত হইবে?' এমতাবস্থায় সে যাহাকিছু পাইবে গনীমত মনে করিবে। উহাকেই সে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ এবং পুরস্কার বলিয়া বুঝিবে এবং ইহার জন্য খোদা তা'আলার লাখ লাখ শোক্র আদায় করিবে এবং বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অসীম নেয়ামত দান করিয়াছেন। আমি ইহার উপযুক্ত ছিলাম না। ফলকথা, এই ব্যক্তি সর্বদা শোক্রগুযার থাকিবে; আর ঐ ব্যক্তি কেবল অভিযোগ করিবে।

শরীঅতী সহজ ব্যবস্থার ক্রিয়াঃ অতএব, বুঝা গেল শরীঅত যে সহজ ব্যবস্থা দান করিয়াছে, তদনুযায়ী আ'মল করিলে অন্তর অধিক শোক্র আদায় করিতে বাধ্য হয়। আর অধিক শোক্র হইতেই মহব্বত বৃদ্ধি পায়। কাজেই শরীঅত প্রদত্ত রোখছত অর্থাৎ, সহজ পন্থানুযায়ী আমল করা উচিত, যেন খোদার মহব্বত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সহজ পন্থার অর্থ এই নহে যে, একেবারে নফ্সের বশীভূত হইয়া পড়িবে এবং যে কাজ নফ্স্ সহজ মনে করে, কেবল তাহাই করিবে; আর বাকী সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিবে।

যেমন, কোন এক পেটুক ব্যক্তিকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কোরআন মজীদের কোন্ আয়াতটি তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا "খাও, পান কর।" এখন দেখুন, তাহার নফ্স্ যেহেতু পানাহারের অনুরক্ত ছিল, কাজেই কোরআনের যাবতীয় নির্দেশের মধ্যে তিনি কেবল এই দুইটি নির্দেশই পছন্দ করিলেন। কেননা, এই আয়াতের মর্মানুসারে খুব সহজে ও শান্তির সহিত খাইতে পাওয়া যায়।

অতএব, বলিতেছিলাম—সহজ ও আরামের অর্থ এরূপ সহজ নহে, এরূপ আরাম প্রশংসনীয়ও নহে; বরং শরীঅত অনুযায়ী নিন্দনীয়। তবে হাঁ! স্বয়ং নবী করীম (দঃ) আল্লাহ্র নেয়ামতস্বরূপ যে সহজ ও আরাম প্রদান করিয়াছেন—শরীঅতের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া তাহা ভোগ করা প্রশংসনীয়। সীমা ডিঙ্গাইয়া আরাম উপভোগ করা নহে।

আমার এক বন্ধু বলিতেনঃ সকল সময়েই কঠিন আ'মল করিলে সওয়াব অধিক পাওয়া যায়। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলামঃ "ইহাতে কি ভেদাভেদ মোটেই নাই?" তিনি বলিলেনঃ "না, সাধারণত কঠিন কাজে অধিক সওয়াব হয়।" ঘটনাক্রমে আছরের নামাযের সময় হইল। আমি তাঁহাকে বলিলামঃ "এখন নামাযের জন্য ওযূ করিতে হইলে দুইটি উপায় আছে—প্রথমত মসজিদের কূপের পানি দ্বারা ওযূ করা যায়; দ্বিতীয়ত, জালালাবাদ হইতে পানি আনিয়া করা যায়। বলুন, আপনি কোন্টি পছন্দ করেন?" তিনি বলিলেনঃ "মসজিদের কূপের পানি দ্বারা ওযূ করাই ত সঙ্গত।" আমি বলিলামঃ "কেন? আপনি যে বলিয়াছিলেন, সকল সময়েই কঠিন কার্যে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। জালালাবাদ হইতে পানি আনিয়া ওযূ করাই তো কঠিন কাজ।" ফলকথা, কঠিন কাজকে সকল সময়ে অধিক সওয়াবের কারণ মনে করা ভুল; বরং প্রথমত ইহা উদ্দেশ্যের সহিত নির্দিষ্ট। যে সমস্ত কার্য 'এবাদতে মাকছুদা' (অর্থাৎ উদ্দেশ্যযুক্ত এবাদত) নহে; বরং শর্ত প্রভৃতি জাতীয়। তাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজেও সহজ পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَمْرَيْنِ اِلَّا اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا

অতএব, আমাদেরও এই হাদীসের মর্মানুযায়ী এমতাবস্থায় রোখছত অনুযায়ী আমল করা উচিত। ওযূও উদ্দেশ্যযুক্ত এবাদত নহে; বরং উদ্দেশ্যযুক্ত এবাদত নামাযের অন্যতম শর্ত।

কাজেই ওযূ সম্বন্ধে সহজ পন্থা অবলম্বন করা সঙ্গত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেখানে 'রোখছতে' এমন কোন শরীঅতসম্মত সুবিধা রহিয়াছে যাহা 'আযীমতে' নাই, সেক্ষেত্রে কঠিন পন্থা 'আযীমত' অবলম্বন না করাই সঙ্গত; বরং রোখছত অর্থাৎ, সহজ পন্থাই তথায় অগ্রগণ্য হইয়া থাকে। ওযূ যেমন উদ্দেশ্যযুক্ত এবাদত নহে, তদ্রূপ যব খাওয়া যদিও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং ছাহাবায়ে কেরামও তাহা পালন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এবাদতের উদ্দেশ্যে করেন নাই; বরং ইহা তাঁহাদের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহাও শুধু শক্তিশালী হযম শক্তি বিশিষ্ট ছাহাবাগণেরই অভ্যাস ছিল। আজকালও যাহারা নিজেদের হযম শক্তির উপর এতটুকু নির্ভর করিতে পারেন যে, আচালা যবের রুটি খাইলে কোন ক্ষতি বা কষ্ট হইবে না, পেট চাপিয়া চাপিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহাদের পক্ষে যবের রুটি খাওয়া দূষণীয় নহে; বরং ভাল ও উত্তম। অবশ্য হুযূরের অনুসরণের নিয়তে খাইলে বিশেষ সওয়াব হইবে।

সুন্নত পালন করার অর্থঃ পক্ষান্তরে যদি দুর্বল হযম শক্তির লোক সুন্নত পালনের আগ্রহে আচালা যবের রুটি খাইয়া নামাযে দাঁড়ায় এবং পরক্ষণেই পেটে এমন তীব্র ব্যথা আরম্ভ হয় যে, দাঁড়াইতে সক্ষম না হইয়া বসিয়া নামায আদায় করে, তবে সেই যব ও যবের ছিল্‌কা (খোসা) খাওয়াতে এত অধিক সওয়াব পাইবে না, বসিয়া নামায পড়িয়া নামাযের যতখানি ফযীলত (সওয়াব) হইতে সে বঞ্চিত হইল, অথচ ইহা নিজেরই কর্মফল।

কিন্তু যব খাওয়া এমনভাবে ত্যাগ করা, যাহাতে নবী (দঃ)-এর সুন্নতের উপর কোন দোষারোপ না হয় এবং যবও খাওয়া না হয়, ইহা দুই বিপরীতের সমাবেশ বটে। এই অসাধ্য সাধন করিতে পারেন খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শেবন্দী (রঃ)-এর ন্যায় মহাপুরুষেরাই। সোব্‌হানাল্লাহ্! কেমন সূক্ষ্ম উপায়ে যব খাওয়া হইতে হাত গুটাইয়া লইলেন। বলিলেনঃ "ভাই! আমরা যবের রুটি খাইতে গিয়া বেআদবী করিয়াছি। তাহাতে আমরা যেন নবী (দঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের সমকক্ষতার দাবী করিয়াছিলাম, যাহা আমাদের পক্ষে অসঙ্গত ছিল। আমাদের মধ্যে ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় রিয়াযত্ করিবার শক্তি কোথায়? ইহা তাঁহাদেরই সামর্থ্যে ছিল—উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত আমাদের জন্য নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন। মোটকথা, সুন্নত মোতাবেক আমল করার অর্থ হুযূর (দঃ)-এর নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ না করা। কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে হুযূরের কার্যাবলী ও অভ্যাসের অবিকল অনুকরণ অনিবার্য নহে।

অতএব, مَاأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ -এর ব্যাপকতার যেই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল যে, আজকাল যত রকমের পরিধেয় বস্ত্র এবং খাদ্যদ্রব্যের প্রচলন রহিয়াছে, ইহার সবগুলিই তো 'সুন্নতে নববী' ও ছাহাবীদের আদর্শের খেলাফ। সুতরাং ভারতীয় জুতাও কোট-প্যাণ্ট প্রভৃতির ন্যায় সুন্নতের খেলাফ। এইরূপে আচ্‌কান, চোগা, ইংলিশ জুতাও কোট-প্যাণ্টের ন্যায় সুন্নত (مَاأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ) -এর অন্তর্ভুক্ত নহে। তবে কেন আজকালকার মৌলবীরা আমাদিগকে কোট-প্যাণ্ট ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছেন। অথচ নিজেরা সুন্নতের বিপরীত আচ্‌কান-চোগা ত্যাগ করিতেছেন না। অতএব, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমার এই বর্ণনায় উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর সত্যান্বেষীদের জন্য যথেষ্ট হইয়াছে এবং ইহাও জানা গিয়াছে যে, ما، শব্দের মধ্যে দুই প্রকারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে—(১) কার্য সংক্রান্ত—অর্থাৎ, হুযূর (দঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম যেরূপ আমল করিয়াছেন। (২) বাণী সংক্রান্ত—অর্থাৎ, যাহা হুযূর (দঃ) নিজে করেন নাই বটে; কিন্তু উহা করিবার জন্য উম্মতকে প্রকাশ্যভাবে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন কিংবা উহা কোন মূলনীতির

অন্তর্ভুক্ত আছে। অথচ সে ক্ষেত্রে হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন শরীঅতগত প্রমাণ নাই। অতএব, এই নীতি অনুসারে ভারতীয় জুতা অনুমতির আওতায় আসিতে পারে। কিন্তু ইংরেজী জুতা ও পোশাক-পরিচ্ছদ কাফেরদের সাদৃশ্যহেতু হারাম হওয়ার কারণ রহিয়াছে। কাজেই ইহার বিধেয়তা কোনরূপেই প্রমাণিত হইতে পারে না।

তথাপি কেহ কেহ সত্যপন্থী হওয়ার দাবী করিয়াও তাঁহাদের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চাল-চলন অবলম্বন করিতেছে না। অথচ সত্যপন্থী এবং মুক্তির যোগ্য হওয়ার মাপকাঠি ছিল—সর্ববিষয়ে مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ অর্থাৎ, হুযূর (দঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যাহা করিয়া গিয়াছেন, সর্ববিষয়ে তদনুযায়ী আমল করা। তাঁহাদের কাজ-কর্ম এবং চাল-চলনের সকল অংশকে অবশ্যই অনুসরণীয় মনে করা উচিত। এক অংশকে যথেষ্ট মনে করিয়া অপর অংশকে ত্যাগ করা উচিত নহে। যেমন, হাল ফ্যাশনের ভদ্রলোকেরা ধর্মীয় যাবতীয় কর্তব্য হইতে কেবলমাত্র মৌলিক বিষয় (সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ) অর্থাৎ, বিশ্বাস্য বিষয়গুলিকে সংশোধন করাই সত্যপন্থী হওয়ার মাপকাঠি স্থির করিয়া লইয়াছেন এবং প্রত্যেক সঠিক বিশ্বাসবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কার্যকলাপ এবং চাল-চলনের বিচার ব্যতীতই নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া থাকেন। অথচ শরীঅতের বিধান ইহার প্রকাশ্য বিরোধী।

আমলই এল্‌মের উদ্দেশ্য ঃ আমি প্রথমে যেই আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়াছি, ইহাই উক্ত আয়াতের মৌলিক বিষয়বস্তু। এই আয়াতে বলা হইয়াছে, কেবল এল্‌মই যথেষ্ট নহে, আমলেরও প্রয়োজন আছে। এই কথাটির প্রতি সচেতন করার জন্য শুধু আখেরাতের অস্তিত্বের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; বরং সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার নিকৃষ্টতা এবং হীনতাও বর্ণনা করিয়াছেন, যেন মানুষ তাহা স্মরণ পথে জাগরূক রাখিয়া পরলোকের জন্য আমল করার উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিতে পারে। এইমাত্র আমি তাহাই বলিলাম, "আমলই এল্‌মের উদ্দেশ্য।" বরং আমি বলি, প্রত্যেক এল্‌মের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

আরও বিশদভাবে বুঝিয়া লউন, مَاهٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ الخ "এই দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নহে। বস্তুত আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন", আয়াতে একথার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, এই আয়াতে শুধু আখেরাতের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদনই উদ্দেশ্য নহে; বরং দুনিয়ার অস্থায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিয়া উহা হইতে বিরাগী করাও উদ্দেশ্য। অন্যথায় কেবল আখেরাতের বিশ্বাস উৎপাদনই যদি উদ্দেশ্য হইত, তবে তজ্জন্য কেবল اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ বলাই যথেষ্ট ছিল। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিষয়টি ইহার সঙ্গে যোগ করাই আমার কথার স্পষ্ট প্রমাণ। অন্যথায় এই আয়াতটিকে অনর্থক দীর্ঘ করা হইয়াছে বলিতে হয়। অথচ কালামুল্লাহ্ সম্বন্ধে এরূপ কল্পনাও মহাপাপ।

এল্‌ম দুই প্রকার। (১) যাহার সম্বন্ধে স্বয়ং জ্ঞানলাভই উদ্দেশ্য। (২) যাহা শুধু আমল করার উদ্দেশ্যে জানিয়া লওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রকারের এল্‌মের মধ্যে তো আমরা এবং সর্বসাধারণ ওলামা শরীক রহিয়াছেন। অর্থাৎ, এস্থলে আমরা যেমন এল্‌ম এবং আমল উভয়কেই উদ্দেশ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছি, তদ্রূপ তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে একমত এবং উভয়কেই উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। যদিও এতটুকু প্রভেদ করিয়া থাকেন যে, কোন বিষয়ের জ্ঞান উহারই জন্য উদ্দেশ্য এবং কোন বিষয়ের জ্ঞান অপর বিষয়ের জন্য উদ্দেশ্য।

যেমন, ওযূর প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা মৌলিক উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহা নামায আদায়ের অপরিহার্য শর্ত বলিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। অতএব, কেবল ওযূর প্রণালীর জ্ঞান লাভ করা যথেষ্ট নহে; বরং ওযূ করিয়া নামায সমাধা করিলেই ওযূ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ সার্থক হইবে। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই।

প্রথম বিষয়ের জ্ঞান—যাহা শুধু জানিয়া লওয়াই মৌলিক উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে সাধারণ ওলামা কেবল জ্ঞান লাভ করাই মুখ্য-উদ্দেশ্য মনে করেন। আমলের জন্য এই শ্রেণীর এল্‌মকে কোন স্তরেই উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। যেমন, আমাদের আলোচ্য বিষয় (আখেরাতের জ্ঞান) হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কিন্তু আমি বলি, এক্ষেত্রে যদিও জ্ঞানলাভই মুখ্য এবং মৌলিক উদ্দেশ্য, তথাপি আমলও উদ্দেশ্যের মধ্যে অংশীদার রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ের জ্ঞান এই জন্য তা'লীম দেওয়া হইয়াছে, যেন আমলের ব্যাপারে তদ্দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমল ভিন্ন জ্ঞানের উদ্দেশ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না।

তক্‌দীরের মাস্‌আলা ঃ সূরা-হাদীদের মধ্যে এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তক্‌দীর সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ

مَـآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ

اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ۝ الخ

অর্থাৎ, "দুনিয়াতে যাহাকিছু ঘটে, তাহা নফসের মধ্যেই হউক কিংবা অন্য কিছুর মধ্যেই ঘটুক। সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তাহা আল্লাহ্ তা'আলার দফ্‌তরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে সহজ কাজ।" সুতরাং দুনিয়ার কোন ঘটনাই আল্লাহ্‌র দফ্‌তরে লিখিত বিষয়ের বিপরীত হইতে পারে না। সম্মুখের বাক্যে এই লিপিবদ্ধ করার কারণ বর্ণনা করিতেছেন; لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ অর্থাৎ, "তোমাদিগকে এই মাসআলাটি এই জন্য তা'লীম দিলাম এবং দফ্‌তরের লিখন সম্বন্ধে অবহিত করিলাম, যেন এই জ্ঞানলাভের পর হারান বস্তুর জন্য তোমাদের মনে কোন দুঃখ এবং চিন্তা না আসে। আবার লব্ধ ও হস্তস্থিত বস্তুর আনন্দ গর্ব-অহঙ্কারের আকারে না হয়।"

পছন্দনীয় ও লোভনীয় পদার্থের হস্তচ্যুত হওয়ার জন্য আফ্‌সোস এবং দুঃখ-কষ্ট না হওয়া ছবরেরই নামান্তর। বস্তুত ছবরের আদেশ আমাদিগকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বহু স্থানে করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে দুঃখ-চিন্তা করিতে নিষেধ করার অর্থ ছবরের আদেশ করা। সারকথা এই দাঁড়াইল যে, তোমাদের ছবরের পূর্ণতা সাধনের জন্য আমি তোমাদিগকে তক্‌দীরের মাস্‌আলা তা'লীম দিয়াছি। পূর্ণ ছবর অবলম্বনের জন্য এই সংবাদটি প্রদান করা একান্ত জরুরী ছিল। কেননা, অদৃষ্টের প্রতি স্থির বিশ্বাস ব্যতীত পূর্ণ ছবর হাছিল করা যায় না। অতএব, ছবর ও তক্‌দীরের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আবশ্যক রহিয়াছে।

চাক্ষুষ দৃষ্টিতেও এই আবশ্যকতার প্রয়োজন বুঝা যাইতেছে যে, অদৃষ্টবাদী লোকের কিংবা তক্‌দীরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারীর পুত্র-বিয়োগ ঘটিলে সে দ্রুত ছবর অবলম্বন করিতে পারে। পক্ষান্তরে তক্‌দীরের প্রতি আস্থাহীন ব্যক্তি এইরূপ দুঃখ ও চিন্তাজনক ব্যাপারে সর্বদা অস্থির ও ব্যথিত থাকে। মনে করে, আফ্‌সোস! চিকিৎসায় ত্রুটি হইয়াছে। অমুক ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকিলে অবশ্যই আরোগ্য লাভ করিত। এই পরিতাপ তাহার চিরসাথী হইয়া থাকে।

তাহার দুঃখ দূর হইবেইবা কেমন করিয়া? স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসী লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ এই আয়াতটির বিশদ অর্থ এই যে, (ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের সম্বন্ধে) মোনাফেকরা বলিয়া থাকেঃ مَاكَانُوْا عِنْدَنَا مَامَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا "তাহারা যদি যুদ্ধে যোগদান না করিয়া আমাদের নিকট থাকিত, তবে মরিতও না, নিহতও হইত না।" তাহাদের এই উক্তি তক্‌দীরের প্রতি ঈমান না থাকারই ফল। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ "যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণ যদি তোমরা তাহাদের যুদ্ধে যোগদান করাই মনে কর এবং তোমরা শহরে নিরাপদে থাকিলে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া মনে কর, তবে দয়া করিয়া তোমাদের নিজেদের মৃত্যুকে ফিরাও তো দেখি। তোমরা তো কোথাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাও না, তবে ঘরে বসিয়া বসিয়া মর কেন?"

সুতরাং বুঝা গেল,"যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া মৃত্যুর কারণ হইতে পারে না; আর ঘরে বসিয়া থাকাও মৃত্যুর প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; বরং তোমাদের মৃত্যু খোদার ইচ্ছাধীন এবং তাঁহার দফ্‌তরে নির্ণীত রহিয়াছে। নির্দিষ্ট মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে ঘরের বদ্ধ কামরায়ই থাক আর যুদ্ধক্ষেত্রেই থাক, মৃত্যুর থাবা হইতে কখনও অব্যাহতি পাইবে না।" وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ "যদিও সুউচ্চ মজবুত কক্ষের মধ্যে থাক না কেন?"

তক্‌দীরে অবিশ্বাসী ধৈর্যহীনঃ কিন্তু এই মোনাফেকের দল যেহেতু তক্‌দীর মানে না, কাজেই আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি তাহাদের ছবর আসিতে পারে না; বরং তাহারা সর্বদা আক্ষেপ করিয়াই মরিবেঃ "আহা! আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলে মারা যাইত না, জীবিতই থাকিত।" কাজেই বুঝা গেল, তক্‌দীরের প্রতি অবিশ্বাসী কখনও ছবর করিতে পারে না; বরং সর্বদা অস্থিরতা ও চিন্তার মধ্যে থাকে এবং ঔষধ ও চিকিৎসার ত্রুটি মনে করিতে থাকে। পক্ষান্তরে দৃঢ় মনে তক্‌দীরের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি সমস্ত ঘটনা, পরিবর্তন, জীবন এবং মৃত্যুকে আল্লাহ্‌রই কার্য বলিয়া মনে করে এবং আল্লাহ্‌র দফ্‌তরে এরূপ লিখিত আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। অবশ্য স্বভাবত স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির বিয়োগজনিত চিন্তা ও শোক এই ব্যক্তির অন্তরেও হইবে। তাহার নফ্‌সও কোন কোন সময় চিকিৎসার ত্রুটি ও অন্যান্য বিষয়কে কারণরূপে তাহার সম্মুখে পেশ করিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে এই কল্পনাও আসিবে যে, প্রকৃতপক্ষে তাহার নির্দিষ্ট সময়ই আসিয়া গিয়াছিল। ধার নেওয়া আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে। সে নফ্‌সকে বুঝাইবে, আমার আত্মীয়জনের আয়ু যেন এই মুহূর্তের সহিতই সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর তাহার শ্বাস গ্রহণের নিমিত্ত কোন বায়ুই অবশিষ্ট ছিল না, তেমনিভাবে চিকিৎসার ত্রুটিও তাহার জন্য নির্ধারিত ছিল। খোদা তা'আলা তাহার মৃত্যুর জন্য বাহ্যজগতে যখন চিকিৎসার ত্রুটিকেই কারণ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, তখন এই ত্রুটি পূরণ করিয়া দেওয়ার মত আর কোন শক্তিই জগতে ছিল না। এতটুকু বুঝাইবার পরে অবশ্যই নফ্‌স ছবর অবলম্বন করিবে এবং তাহার অন্তরে দুঃখ-কষ্ট ও শোক-চিন্তার কোন চিহ্ন বাকী থাকিবে না।

মোটকথা, দেখুন! যদিও তক্‌দীরের মাসআলা মৌলিক উদ্দেশ্য সম্বলিত বিষয়সমূহের অন্তর্গত, যাহা জানা ঈমানের অংশবিশেষ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে পূর্ণ ছবর অবলম্বন উদ্দেশ্য হওয়াও কিতাবী দলিলেই প্রমাণিত রহিয়াছে। বস্তুত ছবর যাবতীয় করণীয় কার্যাবলীর মধ্যে একটি কার্য বটে। অতএব, এই আয়াত দ্বারা আমার এই উক্তির পোষকতা পাওয়া যায় যে, মৌলিক উদ্দেশ্যবিশিষ্ট বিষয়গুলির জ্ঞানলাভও আ'মলের মধ্যে ক্রিয়া করিয়া থাকে, এ সমস্ত এল্‌মের

তা'লীম দ্বারা আমলের সংশোধনও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। সুতরাং সঠিক আকীদা উহাকেই বলা যাইবে, যাহার ফল বা চিহ্ন আমলের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যথায় তাহার বিশ্বাস ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থে তাহার বিশ্বাস সঠিক নহে বলিতে হইবে।

এই মর্মের পোষকতায় হুযূর (দঃ)-এর একটি হাদীসও রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা শেষ রাত্রিতে অবতীর্ণ হন।" এতদ্দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ দেওয়াই উদ্দেশ্য। কিন্তু রাত্রি জাগিয়া এবাদত করার উৎসাহ প্রদান প্রসঙ্গে এই সংবাদ প্রদান করায় বুঝা গেল যে, কেবল সংবাদ দেওয়াই উদ্দেশ্য নহে; বরং রাত্রি জাগিয়া এবাদত করা এবং বিশেষ করিয়া তাহাজ্জুদের নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদানই এই সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্য। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ হওয়ার এল্‌ম মৌলিক বিশ্বাস সম্বলিত এল্‌ম। কিন্তু এই এল্‌মের তা'লীমেও একটি আমলের পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্য রহিয়াছে। অতএব, বুঝা গেল, সর্বপ্রকারের এল্‌ম, মূলত তাহাই উদ্দেশ্য হউক কিংবা না হউক, ইহাতে আমলের সংশোধনও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। এইরূপে আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতে যেমন আখেরাতের জ্ঞান প্রদান উদ্দেশ্য, তদ্রূপ দুনিয়ার প্রতি বিরাগ উৎপাদনও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

খোদার রহস্যসমূহের অনুসন্ধান ঃ কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা আমলের ধারই ধারি না। আমাদের অনুসন্ধানের দ্বার এবং যাবতীয় চেষ্টার কেন্দ্র শুধু জ্ঞানলাভ করা। সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর মাসআলা নিয়া মাথা ঘামাইতে থাকি। আজ আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ হওয়ার মাসআলা প্রমাণ করিলাম, কাল আবার তাঁহার আগমনের মাসআলা প্রমাণ করিবার পশ্চাতে লাগিয়া গেলাম। ইহা হইতে অবসর পাইলে আবার আরশের উপর অবস্থানের মাসআলার চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম এবং সমস্ত যুক্তিগত জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম—নিজেই সেইগুলির উত্তর চিন্তা করিতে লাগিলাম। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধীয় মাসআলায় আলোচনা-সমালোচনা করা এবং সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করা সুন্নতের খেলাফ। হযরত ওমর (রাঃ) এসমস্ত মাসআলার আলোচনা করা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ اَبْهِمُوْا مَا اَبْهَمَهُ اللهُ تَعَالٰى "স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয়কে অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, বিশদভাবে কিছু বলেন নাই, তোমরাও উহাকে অস্পষ্টই রাখ। তোমাদের ইহাই নির্দেশ পালন—অস্পষ্টকে অস্পষ্ট মনে করিয়া ঈমান আন।"

এক বুযুর্গ লোক অপর এক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (দঃ)-এর সহিত মে'রাজের রাত্রিতে কি কি কথাবার্তা বলিয়াছিলেন এবং কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল ?" তিনি উত্তর করিলেন ঃ

اکنوں کرا دماغ که پرسد ز باغباں
بلبل چه گفت وگل چه شنید وصبا چه کرد

"এখন কাহার সেই মস্তিষ্ক আছে যে, উদ্যান-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিবে, বুলবুল কি বলিয়াছে ? ফুল কি শুনিয়াছে এবং ভোরের বায়ু কি করিয়াছে ?" অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাই যখন এসব ঘটনা ও রহস্যকে فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى "অতঃপর তিনি তাঁহার বান্দার সহিত আলাপ করিলেন যাহাকিছু আলাপ করিলেন" আয়াতে অস্পষ্ট রাখিয়া দিয়াছেন। এখন আমাদের কি সাধ্য, সে সম্বন্ধে মুখ খুলিতে পারি ? যখন সে দরবারে এমন অস্পষ্ট রাখাই লক্ষ্য ছিল, তখন উহার বিরুদ্ধে আমরা কি বলিতে পারি ? আমাদের কর্তব্য শুধু এই যে, আমাদের সম্মুখে যাহাকিছু বিশদভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, কেবল উহারই বিস্তারিত অনুসন্ধান করি; আর যাহাকিছু আমাদিগকে বলা

হয় নাই, অস্পষ্ট রাখাই সেখানে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করা হইয়াছে, উহার উপর অস্পষ্টরূপেই বিশ্বাস রাখি। যেমন, সত্যিকারের মুমেনের গুণ বর্ণনায় আল্লাহ্ বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ "যাহারা গায়বের উপর ঈমান রাখে।" আমাদের অস্পষ্ট বিষয়ের প্রতি অস্পষ্টরূপে বিশ্বাস রাখিয়া উক্ত প্রশংসিত মু'মেনগণের দলভুক্ত হইয়া যাওয়া উচিত। ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আকলের ঘোড়া দৌড়ান উচিত নহে।

এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টান্ত সেই মেহ্মানের ন্যায় হওয়া উচিত, যাহার থাকার জন্য গৃহস্বামী বিশাল ও প্রশস্ত একখানা ঘর ছাড়িয়া দিল। উহাতে বহুসংখ্যক কামরা রহিয়াছে, বিচিত্র আসবাবপত্রে সুসজ্জিত এবং দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ। কিন্তু তিনি মেহমানকে বলিয়া দিলেন, এই মুক্তদ্বার চারিটি কামরায় আনন্দের সহিত থাক এবং বেড়াও। সাবধান! রুদ্ধদ্বার কামরাগুলি কখনও খুলিবার চেষ্টা করিও না। এখন তাহার উচিত, যেই কামরাগুলিতে আনন্দের সহিত থাকিবার ও বেড়াইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কেবল তাহাই স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা, নিষিদ্ধ কামরাসমূহের কাছেও যাওয়া তাহার উচিত নহে। যদি সে রুদ্ধদ্বার কামরাগুলিরও তালা ভাঙ্গিয়া ফেলে কিংবা উহা বন্ধ করিয়া রাখার কারণ অনুসন্ধান করে, তবে তাহা ভদ্রতা বিরোধী এবং অপরাধজনক কার্য বলিয়া গণ্য হইবে।

এইরূপে আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আলোচনা-সমালোচনা করা আমাদের জন্য শোভা পায়। কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ে মুখ খুলিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে সমস্ত বিষয়ে কিছু মন্তব্য করা অনধিকার চর্চা এবং অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। তদুপরি আল্লাহ্র আদেশের অবমাননা বলিয়া বিবেচিত হইবে। পূর্বোক্ত বুযুর্গ লোক এই কারণেই বলিয়াছিলেন ঃ

اکنوں کرا دماغ کہ پرسد ز باغباں   بلبل چہ گفت وگل چہ شنید وصبا چہ کرد

"এখন কাহার সেই মস্তিক আছে যে, মালীকে জিজ্ঞাসা করিবে—বুলবুল কি বলিয়াছে? ফুল কি শুনিয়াছে এবং প্রাতঃসমীরণ কি করিয়াছে?" কাহার সাধ্য সেই রহস্য ও সূক্ষ্মতত্ত্ব উদঘাটন করিতে পারে? আমাদের জ্ঞানের কি সাধ্য এমন বিপজ্জনক পথে পা বাড়ায়? খোদার রহস্য উদঘাটন করা মানব শক্তির বাহিরে। খোদার সত্তা ও গুণাবলীর রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। ইহা অবগত হওয়া অসম্ভব বিষয়সমূহের অন্তর্গত। ইহাতে সমস্ত জ্ঞানী লোকই একমত।

আমরা কেবল এতটুকু বলিতে পারি যে, সেই পবিত্র সত্তার রহস্য যেমন উদঘাটনীয় নহে, তদ্রূপ তাঁহার অবতরণও তাঁহার মর্যাদারই অনুরূপ, সাধারণ অবতরণের ন্যায় নহে। এইরূপে তাঁহার আগমনও তাঁহার মর্যাদা এবং মহত্ত্বের উপযোগী। যেমন আগন্তুক তেমনই আগমন। আগন্তুকের তত্ত্ব জানিতে পারিলেই সেই আগমনের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। কেননা, আগমনের এমন কোন নির্দিষ্ট স্বরূপ নাই যাহাতে সমস্ত আগন্তুকই নির্বিচারে শরীক থাকিবে এবং আগমন সকলের মধ্যে ব্যাপক একটি কার্য হইবে। বরং আমরা সর্বদা দেখিতেছি, আগন্তুক বিভিন্ন রকমের হইলে আগমনও বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। কাজেই আগন্তুকের তথ্য অবগত হওয়া ব্যতীত আগমনের তথ্য জানার উপায় নাই। দেখুন, جاء زيد "যায়েদ আসিয়াছে" বাক্যে যায়েদের আগমন সংবাদ রহিয়াছে। এই আগমনের তথ্য জানিতে হইলে প্রথমে যায়েদকে জানিতে হইবে। যায়েদকে জানিতে পারিলেই বুঝা যাইবে যে, সে নিজে হাঁটিয়া আসার কারণে

আগমন ক্রিয়ার কর্তা হইয়াছে। কিন্তু جاء المدينة 'শহর আসিয়াছে' বাক্যে স্থানের তথ্য জানার পর স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে যে, কোন চলমান পদার্থ নিজে হাঁটিয়া আসিয়া শহরে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া "শহর আসিয়াছে" বলা হয়। অন্যথায় ইহা সত্য যে, শহর নিজের স্থান হইতে নড়ে নাই। এইরূপে কল্পনাশক্তিতে কোন কথার আগমন হইয়াছে বলিলে কল্পনা হাঁটিয়া কথার কাছে গিয়াছে কিংবা কথা হাঁটিয়া আসিয়া কল্পনায় প্রবেশ করিয়াছে বুঝাইবে না ; বরং চিন্তার আগমন কল্পনার মাধ্যমে হইয়া থাকে। চিন্তাশক্তির আলোড়নে কোন মত কিংবা চিন্তা স্থির করিয়া লওয়ার নামই কল্পনায় আসা। এইরূপে ভোরের আগমন প্রভৃতি।

এখন দেখুন, এই তিন প্রকারের আগন্তুকই ক্রিয়ার কর্তা। কিন্তু আগন্তুকত্রয়ের স্বরূপ বিভিন্ন হওয়ায় আগমনের স্বরূপে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হইয়াছে। একের আগমনের সহিত অপরের আগমনের কোনই সামঞ্জস্য নাই।

সুতরাং আমরা যখন দেখিতেছি যে, সৃষ্ট জীবের বা পদার্থের মধ্যে কোন আগন্তুকের স্বরূপ না জানা পর্যন্ত উহার আগমনের স্বরূপ জানা যায় না। এইরূপে স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার স্বরূপ অবগত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার অবতরণ বা আগমনের স্বরূপ জানিবারও কোন উপায় নাই। অতএব, প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা উপলব্ধি কর, অতঃপর তাঁহার অবতরণ এবং আগমনের স্বরূপ আমি বলিয়া দিব। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের স্বরূপ অবগত হওয়া অসম্ভব। তাহা তুমি কখনও অবগত হইতে পারিবে না। কাজেই তাঁহার কার্যাবলী এবং গুণাবলীর তাৎপর্য অবগত হওয়াও তোমার আমার সকলের জন্যই অসম্ভব। সুতরাং এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা সুন্নতের বিপরীত এবং ইহাতে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

এই কারণেই ইমাম শাফেঈ (রঃ) দার্শনিকদের ইমামতে নামায পড়া মকরূহ্ বলিতেন। এই শ্রেণীর দার্শনিক তাহারাই যাহারা আকায়েদ সম্বন্ধীয় আলোচনায় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে ; আর যাহারা ন্যায়পথ লঙ্ঘন করিয়া নিষিদ্ধ বিষয়ের তথ্য অবগত হওয়ার আয়োজন করিয়া উহাতে এমন পেরেশান ও অস্থির থাকে যে, সেক্ষেত্রে আকলের ঘোড়া অচল এবং তীক্ষ্ণধার অস্ত্র অকর্মণ্য হইয়া যায়। সেরূপ ক্ষেত্রে নানা প্রকার দুর্বল ও বেখাপ্পা ব্যাখ্যা করে। ঐ সমস্ত দার্শনিকের পশ্চাতে নামায মকরূহ নহে যাঁহারা বেদআত খণ্ডন এবং বাতিলপন্থীদের জটিল প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা উত্তর প্রদানের উদ্দেশ্যে দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকেন। কেননা, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বেদআত খণ্ডন করা এবং ধর্মীয় মাসআলাসমূহে বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করা। তাঁহারা দুর্বোধ্য তথ্যসমূহ অবগত হওয়ার ইচ্ছাও করেন না এবং দাবীও করেন না। কোথাও তাঁহারা মোটামুটিভাবে এরূপ আলোচনা করিলেও তথ্য অবগতির দাবীস্বরূপ নহে ; বরং প্রতিবাদ করিয়া থাকেন মাত্র। অর্থাৎ, কেহ তথ্যাবগতির দাবী করিলে তাঁহারা সেখানে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন। এই প্রকারের দর্শন প্রশংসনীয় এবং উত্তম বলিয়া গণ্য করা হয়।

মোটকথা, যেমন আল্লাহ্‌র 'শান' তেমনি তাঁহার অবতরণ। আমরা তাঁহার যথার্থতা জানিতে পারি না যে, তিনি কেমন সত্তা—যিনি দেহ, জড় পদার্থ, বরং জড়হীন সৃষ্ট পদার্থ হইতেও পবিত্র, গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতামুক্ত এবং বিচিত্র পরিপূর্ণতা গুণ বিশিষ্ট। আমরা তাঁহার বিচিত্র গুণাবলীও জানিতে পারি না। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর তথ্য সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ, তাহাতে এমন বিচিত্র কি ? দুনিয়াতে এমন বহু পদার্থ রহিয়াছে যাহার সন্ধান আজ পর্যন্তও আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল ইহাই নহে যে, আমরা বড় বড় রহস্য এবং অজ্ঞাত জগত

সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিয়াছি; বরং সর্বক্ষণ আমাদের নিকটে অবস্থিত অনেক সাধারণ বস্তু সম্বন্ধেও আমরা অনবগত। উহা জানিতে পারিলে বিস্মিত হইয়া বলি, এমন সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে আমরা এতদিন অজ্ঞ ছিলাম। অতএব, আমরা এক পবিত্র, অবোধ্য, অদৃশ্য এবং অনন্ত গুণের অধিকারী সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে আমাদের মর্যাদায় এমন কি বিশ্রী দাগ লাগিয়া যাইবে? দুঃখের বিষয়! এমন সাধারণ বিষয়ে অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও আমাদের সম্ভ্রমের কোন হানি হইল না। অথচ এমন মহামহিমান্বিত ও প্রতাপশালী সত্তার তথ্য অবগত না হওয়ার কারণে যেন আমাদের যোগ্যতায় দাগ লাগিয়া যায়। আমরা তো কোন্ ছার; আমাদের অস্তিত্বইবা কি? এই ময়দানে অনেক্ মহান খোদাতত্ত্ববিদ—যাঁহারা আজীবন তত্ত্বজ্ঞান অনুসন্ধানে আল্লাহ্ পাকের রহস্য ও মা'রেফাত সম্বন্ধীয় গবেষণায় মশ্গুল রহিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের একটি মুহূর্তও মা'রেফাত চর্চা ছাড়া অতীত হয় নাই। তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে শেখ সাদী (রঃ) বলিতেছেন ঃ

دور بیناں بارگاه الست ـ غیر ازیں پے نبرده اند که هست

“ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর দরবারের প্রতি দূর-দূরান্ত হইতে দৃষ্টিনিক্ষেপকারিগণ তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকে না।” এইরূপে মা'রেফাত তত্ত্ববিদ শীরাযীও বলিতেছেন ঃ

عنقا شکار کس نه شود دام باز چیں ـ کینجا همیشه یاد بدست ست دام را

“আন্ক্বাকে কেহ কখনও শিকার করিতে পারে না। জাল পাতিলে কোন লাভ নাই। এই ক্ষেত্রে সর্বদা বায়ু ছাড়া আর কিছুই তাহার ভাগ্যে নাই।” এখানে 'আন্ক্বা' বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কবি বলিতেছেন ঃ “খোদার সত্তার তথ্য অবগত হওয়ার জন্য আকলের জাল পাতিও না। এখানে বায়ু ছাড়া জালে আর কিছু আসিবে না।” মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন ঃ

در تصور ذات او را گنج کو ـ تا در آید در تصور مثل او

“আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে।” অর্থাৎ, খোদা তা'আলার মত কোন সত্তার পদার্থ ধ্যান করাও অসম্ভব। কেননা, তুলনীয় পদার্থ ধ্যান করিতে না পারিলে তুল্য পদার্থের ধ্যান করা যায় না। যেহেতু তুল্য বস্তুর উপলব্ধির জন্য শর্ত হইল—উভয় বস্তু অন্তরে মূর্ত হওয়া; অথচ তুলনীয় অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের সত্তা উপলব্ধি করা এবং মূর্ত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার তুল্য কোন পদার্থের ধ্যান করাও সম্ভব নহে। আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থতা ইহজগতে তো দূরের কথা, আখেরাতেও অবগত হওয়া সম্ভব হইবে না। কেবল দর্শন লাভ হইবে মাত্র। অতএব, সমস্ত তথ্য অবগত হওয়ার জগৎ আখেরাতেও যখন তাঁহার তথ্য জানা যাইবে না, তখন ইহজগতে কেমন করিয়া তাহা জানার আশা করা যাইতে পারে? এই মাস্আলায় সমস্ত জ্ঞানী এবং মা'রেফাততত্ত্ববিদগণ একমত।

আল্লাহ্ তা'আলার এল্ম, কুদরত প্রভৃতি গুণের ন্যায় যে সমস্ত গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলা ও মানবের মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে ব্যাপক রহিয়াছে—তাহাতে কেহ এরূপ ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নহে যে, মানুষের মধ্যে এসমস্ত গুণাবলীর তথ্য তো আমরা যথার্থরূপেই অবগত হইতে পারি, এই গুণাবলীই তো আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে রহিয়াছে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর তথ্য

অবগত হওয়া সম্ভব হইল। ইহার উত্তর এই—তথ্যের প্রেক্ষিতে মানবের ও আল্লাহ্ তা'আলার এ সমস্ত গুণাবলী এক নহে। শুধু নামের পরিপ্রেক্ষিতে এক বলা যায়। বস্তুত উভয়ের স্বরূপ পৃথক পৃথক। এই মূলনীতির উপর একটি আয়াতের তাফ্‌সীর খুবই সহজ হইয়া যায়ঃ

فَامَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَاشَاۤءَ رَبُّكَ الخ

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَاشَاۤءَ رَبُّكَ

এখানে দুইটি প্রশ্ন উত্থিত হয়—(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দোযখী ও বেহেশ্‌তী উভয়ের ক্ষেত্রে خَالِدِيْنَ فِيْهَا -এর পরে مَادَامَت السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ বলিয়াছেন। অর্থাৎ, উভয়ের স্থায়িত্ব আসমান এবং যমীনের স্থায়িত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হইবে। বলাবাহুল্য, কিয়ামতের দিন যখন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে; তখন সমস্ত সৃষ্টজগতের ন্যায় আসমান-যমীনও ধ্বংস হইবে, সুতরাং আসমান-যমীন ধ্বংস হইয়া গেল এবং ইহাদের স্থায়িত্ব রহিল না—কাজেই দোযখী এবং বেহেশ্‌তীদের স্থায়িত্ব অনন্তকালের জন্য হইল না। অর্থাৎ, দোযখীও দোযখের মধ্যে অনন্তকাল থাকিবে না, বেহেশ্‌তীও বেহেশ্‌তের মধ্যে অনন্তকাল থাকিবে না, অথচ ইহা বাস্তববিরোধী।

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, দোযখীদের দোযখে এবং বেহেশ্‌তীদের বেহেশ্‌তে থাকার স্থায়িত্বকে যেই আসমান-যমীনের স্থায়িত্বের সহিত সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা এই নশ্বর জগতের আসমান-যমীন নহে; বরং পরলোকের আসমান-যমীন এবং উহাদের স্থায়িত্ব অনন্ত ও অসীম। ইহাতে বিস্মিত হইবেন না যে, তথায় কি আসমান-যমীন হইবে? বুঝিয়া লউন, তথাকার আসমান-যমীন ইহজগতের আসমান-যমীন অপেক্ষাও বিরাট হইবে। এই মর্মে মাওলানা রূমী (রঃ) বলিতেছেনঃ

غیب را ابرے وبادے دیگرست ۔ آسمانے آفتابے دیگرست

"অদৃশ্য জগতের মেঘ, বায়ু এবং আসমান ও সূর্য অন্য ধরনের। তথাকার মেঘ এবং পানি স্বতন্ত্র। তথাকার আসমান এবং সূর্যও পৃথক।" কিন্তু আমি ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর কথা শুনাইতেছি। ইহজগতেই অনুরূপ বিচিত্র বস্তু বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ, রূহ বা আত্মা; আত্মিক জগতের আসমান-যমীন এই আসমান-যমীন অপেক্ষা অধিকতর বিচিত্র। এই মর্মে হাকীম সানাঈ বলিতেছেনঃ

آسماں هاست در ولایت جاں   کار فرمائے آسماں جہاں
در ره روح پست وبالا هاست   کوه هائے بلند وصحرا هاست

"আত্মিক জগতে ইহজগতের আসমান-যমীনের ন্যায় কার্যকরী আসমান রহিয়াছে। আত্মার পথে উঁচু-নীচুও আছে এবং পাহাড়-জঙ্গলও আছে।" এইদিকেই আর একজন তত্ত্বজ্ঞানী (আরেফ) ইঙ্গিত করিয়াছেনঃ

ستم ست اگرهوست کشد که بسیر سر و سمن درآ
تو ز غنچه کم نه دمیدهٔ در دل کشا به چمن درآ

“দুঃখ এই যে, তুমি সাইপ্রাস বৃক্ষের বাগানে ভ্রমণ করার জন্য লালায়িত। তুমিও নব প্রস্ফুটিত কলি। হৃদয়ের দ্বার খোল এবং এই বাগানেই ভ্রমণ কর।” এই মর্মেই আরেফ শীরাযী বলিয়াছেন ঃ

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت ست – چو کوئے دوست هست بصحرا چه حاجت ست

“নির্জনতাপ্রিয় ব্যক্তি কোলাহল পছন্দ করে না। বন্ধুর গলিতে অবস্থানকারীর জন্য জঙ্গলের প্রয়োজন নাই।” মাওলানা রূমী (রঃ)-ও এই মর্মে বলিয়াছেন ঃ

اے برادر عقل یکدم با خود آر – دمبدم در تو خزاں ست و بهار

“ভ্রাত ঃ! কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানের সাহচর্য অবলম্বন কর এবং দেখ, স্বয়ং তোমার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই হেমন্ত ও বসন্তকাল রহিয়াছে।”

মোটকথা, যখন এই নশ্বর জগতের সুবিধার জন্য আসমান এবং যমীন রহিয়াছে, তখন সেই স্থায়ী জগৎ পরলোকের সুবিধার জন্য আসমান-যমীনের অধিক প্রয়োজন এবং তাহাও স্থায়ীই বটে ; সুতরাং مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ (আসমান-যমীনের স্থায়িত্বকাল)-এর দ্বারা সীমাবদ্ধ করাতে দোযখ ও বেহেশ্‌তে অবস্থানের স্থায়িত্ব অনন্ত হওয়াতে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।

আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও হেকমত ঃ অবশ্য আর একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, তবে এই সীমাবদ্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল ? আখেরাতে মুমেনগণ বেহেশ্‌তে এবং কাফেররা দোযখে অনন্তকাল স্থায়ীভাবে থাকিবে বলিয়া যখন বলিয়া দেওয়া হইল, তখন আবার ইহাকে আসমান-যমীনের স্থায়িত্ব (مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ) -এর সহিত সীমাবদ্ধ করিলেন কেন ? যদিও স্থায়ী পদার্থের সহিতই সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে নূতন এবং অতিরিক্ত ফায়দা কি হইল ? এই প্রশ্নের উত্তর হইল, ইহাতে এক বিচিত্র সূক্ষ্মতত্ত্ব রহিয়াছে। ইহাতে উক্ত স্থায়িত্বের তাকীদ করা হইয়াছে, তাহাও এক বিচিত্র এবং অভিনব পদ্ধতিতে। خَالِدِيْنَ فِيْهَا (চিরস্থায়ী থাকিবে)-এর মধ্যে এই বিচিত্র ধরনের তাকীদ ছিল না।

মনে করুন, কোন ব্যক্তিকে একটি বাসস্থান অনন্তকালের জন্য দেওয়া হইল এবং বলিয়া দেওয়া হইল, যতদিন এই ঘরের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তুমি এই ঘরে বাস করিবে, স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার গুরুত্বব্যঞ্জক ইহা অপেক্ষা আর কোন্ শব্দ হইতে পারে, তাহা আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন। ঠিক এইরূপেই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ “তোমাদিগকে বেহেশ্‌ত এবং উহাতে বাস করার অধিকার অনন্তকালের জন্য দেওয়া হইতেছে—যে পর্যন্ত বেহেশ্‌তের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। অনন্তকাল পর্যন্ত ইহা তোমাদের ও তোমাদের পিতা এবং পিতামহের জন্য থাকিবে, কখনও তোমাদিগকে ইহা হইতে বাহির করা হইবে না।” বলাবাহুল্য, বেহেশ্‌তের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী ও অনন্ত। অতএব, এই তাকীদ مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ (আসমান-যমীনের স্থায়িত্ব) সংযোগ করার ফলে এমন একটি সূক্ষ্ম বিষয় পাওয়া গেল, সহস্র প্রকারে ব্যাখ্যা করিলেও এত দৃঢ়তার সহিত তাহা ব্যক্ত হইত না। এখানে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। অবশ্য ইহা অদ্যকার আলোচ্য বিষয় ছিল না, প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করিলাম।

এখন সৃষ্ট মানবের এবং স্রষ্টা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পার্থক্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি। প্রশ্নটি এই—বেহেশ্‌তী এবং দোযখী উভয়ের সম্বন্ধে خَالِدِيْنَ فِيْهَا বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল, তাহারা নিজ নিজ বাসস্থানে অনন্তকাল বাস করিবে। অথচ اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ

"কিন্তু তোমার প্রভুর ইচ্ছাধীন" বাক্যে বুঝা যায়, তাহাদের অনন্তকাল অবস্থান নিশ্চিত নহে। কেননা, উক্ত বাক্যে দেখা যায়, আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিতে পারেন। অনন্তকালের জন্য ওয়াদা নাই। ইহাতে বেহেশ্‌তীদের সাহস ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহারা ভাবিবে, আমাদের যাবতীয় চেষ্টা ও পরিশ্রমের মূলে ছিল অনন্তকাল বেহেশ্‌তে অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা। এই অনন্ত সুখের জন্যই দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামত পরিত্যাগ করিয়াছি। এই অনন্ত সুখ ভোগই ছিল আমাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র। দুর্ভাগ্যবশত সেই অনন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া গেল এবং দোযখীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কলি ফুটিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিবে, দোযখের অনন্ত শাস্তির কথা শুনিয়া দুনিয়ার সমস্ত স্বাদই তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। চল, এখন সেই আশঙ্কা হইতে নিশ্চিন্ত হইলাম।

ইহার উত্তর এই—স্থায়িত্ব অনন্তকালই থাকিবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিপরীত ইচ্ছা করিলে অনন্ত থাকিবে না। তবে যেহেতু বহু দলিল দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও মুমেনকে বেহেশ্‌ত হইতে এবং কাফেরকে দোযখ হইতে বাহির করিবেন না, কাজেই অনন্ত স্থায়িত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। সুতরাং অনন্ত স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা রহিল না।

তবে একটি প্রশ্ন এই থাকিয়া যায় যে, (اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ) বাক্য সংযোগ করা সত্ত্বেও যখন "চিরস্থায়ী থাকিবে" (خٰلِدِيْنَ فِيْهَا) বাক্যে বর্ণিত অনন্ত স্থায়িত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটিল না, তবে ইহা সংযোগ করার সার্থকতা কি? সার্থকতা এই যে, ইহাতে আল্লাহ্‌র স্থায়িত্বের এবং মানবের স্থায়িত্বের প্রভেদ স্পষ্ট হইয়া গেল। এখন আর কোন সাধারণ মানুষও কল্পনা করিতে পারিবে না যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশের পরে আমরা তো স্থায়িত্বের সার্টিফিকেট পাইয়া গিয়াছি। তবে আমরা যে স্থায়িত্ব হইতে নীচে ছিলাম, আল্লাহ তা'আলাই দয়া করিয়া আমাদিগকে নিজের স্থায়িত্বের স্তরে উন্নীত করিয়া নিয়াছেন। ফলত আজ খোদার ও আমাদের ব্যবধান দূরীভূত হইয়া গেল। আমরাও তাঁহার ন্যায় স্থায়িত্বে স্বত্ববান হইয়া গেলাম। এরূপ কল্পনা 'শির্‌ক', ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব, এই শ্রেণীর শিরকজনক কল্পনার হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করার জন্য খোদার উপর ন্যস্ত হওয়া (اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ) কথাটি যোগ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে (خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا) বাক্যের মর্মানুযায়ী নিজেদের পারলৌকিক স্থায়িত্বের জন্য এরূপ গর্ব করিও না যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ হইয়া গেলে, অনন্ত স্থায়িত্ব যদিচ এখন তোমাদের ভাগ্যেও আসিয়াছে, কিন্তু তোমাদের স্থায়িত্ব আমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যতদিন ইচ্ছা স্থায়িত্বের উপর রাখিব। আবার যখন ইচ্ছা কানে ধরিয়া বাহির করিয়া দিব। অবশ্য বাহির করিব না ইহাও সত্য, কিন্তু আমার ইচ্ছাধীন অবশ্যই থাকিবে। পক্ষান্তরে আমার স্থায়িত্ব কাহারও ইচ্ছাধীন নহে। আমার সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, কাহারও ইচ্ছার মুখাপেক্ষী নহে। এই স্থায়িত্ব লোপ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

হযরত শাহ্ আবদুল কাদের (রঃ) এই আয়াতের তাফ্‌সীরে অতি সহজ কথায় এই মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেনঃ اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ বাক্যটি দ্বারা এতটুকু বুঝান উদ্দেশ্য যে, এই স্থায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ্ এবং মানুষের গুণাবলীর মধ্যে মূল পার্থক্য ইহাই, যাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

মানুষের পারলৌকিক স্থায়িত্ব প্রসঙ্গে একটি কাহিনী মনে পড়িল। কোন একজন গ্রাম্য লোক কালেক্টরের দরবারে যাইয়া খুব আদবের সহিত সালাম করিল এবং অতি বিনয়ের সহিত তাঁহার